মাসিক

আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-০১

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইং, রবিউস সানী ১৪৩৬ হি., মাঘ ১৪২১ বাং

ربيع الثانى ١٤٣٦ فبرائر ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

হাফেজ আখতার হোসাইন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :............................. ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২ ..... ৫
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৯
মাওয়ায়েযে ফকীহুল মিল্লাত :
সুন্নাতের অনুসরণই কামিয়াবীর একমাত্র পথ........ ১০
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
আযানের সঠিক পদ্ধতি ও জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান..... ১৫
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
জামা'আতবদ্ধ নামাযে কাতার সোজা করা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর গুরুত্ব ও পদ্ধতি........ ১৯
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী
মুসলিম সমাজে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব............... ২৪
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী
মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৩....... ২৭
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১০........ ৩২
সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাকিব ফয়জাবাদী কাসেমী
মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার ৯......... ৩৮
মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪২
মলফূজাতে আকাবের ৪৬
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ মাসিক আল-আবরারের

আল্লাহ রাববুল আলামীনের অপার রহমতে মাসিক 'আল-আবরার' বর্তমান সংখ্যাটির মাধ্যমে তার ধারাবাহিক প্রকাশনার চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল। এর জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহর শোকর আদায় করি।

ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর স্বনামধন্য শাগরেদ, মুহিউস সুন্নাহ হযরতুল আল্লাম মাওলানা আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর খলীফা, উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি, মুফতিয়ে আজম বাংলাদেশ ফকীহুল মিল্লাম মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর সাহসিক দিকনির্দেশনা ও আন্তরিক দু'আর মাধ্যমেই দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক এ সাময়িকীটির প্রথম সফর শুরু হয় ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ইং সালে।

এর যাত্রাপথ শুধুই ফুল বিছানো, অত্যন্ত নরম তুলতুলে ছিল না; বরং বহু প্রতিকূলতার দুর্গম কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়েই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত এই মুসাফিরের এ পর্যন্ত আসা।

যাত্রাপথে এর অকপট আন্তরিক সঙ্গী ছিলেন বড় বড় উলামায়ে কেরাম, যাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লেখা, গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ, নিবন্ধের সাজে একে সজ্জিত করতে সহযোগিতা করেছেন। সর্বস্তরের লোক প্রতিটি মোহনায় এর সাথে আলিঙ্গন করে একটি সুবিশাল কাফেলার রূপ দিয়েছেন আন্তরিক ও সুহৃদ পাঠকগণ। যাদের যেভাবেই সহযোগিতা এর জন্য রয়েছে, আমরা সকলের শোকরিয়া আদায় করি এবং তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এর সূচনালগ্নে দেশ-বিদেশের শীর্ষ মুরব্বিগণ আন্তরিক দু'আ দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আমরা মনে করি, এই ছোট্ট মেহনতের ব্যাপক সফলতায় তাঁদের দু'আ ও আন্তরিকতার বরকত সব সময়ই প্রসারিত। তাঁদের বাণী ও দু'আর অংশবিশেষ প্রদত্ত হলো।

বিশ্ববিখ্যাত আওলাদে রাসূল হযরতুল আল্লাম সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব (দা.বা)-এর দু'আ,

"আমার আশা এবং দু'আ যেন অজস্র বছর যাবৎ পত্রিকাটি সফলতার সাথে অতিক্রম করে এবং জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক, গবেষকদের কলমী প্রচেষ্টা সকল মুসলিম নর-নারীর অন্তরে কুরআন-সুন্নাহর আলো প্রজ্জ্বলিত করে যেতে পারে।"

বর্ষীয়ান লেখক ও প্রখ্যাত ইসলামী বুদ্ধিজীবী হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব (দা. বা.) বলেছেন,

"মাসিক আল-আবরার পত্রিকাটি ইসলামী মিডিয়ায় একটি আশাব্যঞ্জক সংযোজন বলে আমি মনে করি।"

ইসলামী বিশ্বের খ্যাতিমান আরবী সাহিত্যিক হযরতুল আল্লাম সুলতান যওক (দা.বা) বলেন,

"ধারণাই ছিল না যে, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় এ রকম একটি যুগোপযোগী সাময়িকী নিয়মিত বের হবে। সুন্দর প্রচ্ছদ, ভালো কাগজ ও মানসম্পন্ন লেখার দ্বারা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে আমার ধারণা।... মনে হচ্ছে, এ পত্রিকার মাধ্যমে একদল সৈনিক তৈরি হবে, যারা প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রবেশ করে দ্বীন ও সমাজের খেদমত করে এবং বাতিলের মোকাবিলা করে দ্বীনি দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।"

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সম্মানিত মুহতামিম হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী (দা.বা.) বলেন,

"মাসিক আল-আবরার কয়েকটি কারণে দেশব্যাপী সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রথমত : যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর নামে পত্রিকাটির নামকরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সমসাময়িক যুগের প্রখ্যাত মুরশিদে রব্বানী ও প্রখ্যাত মুফতী ফকীহুল মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা।

তৃতীয়ত : সংক্ষিপ্ত সময়ে সাময়িকীটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়োপযোগী বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত, সমসাময়িক বাতিল দলগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থনীতিসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো দেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।..."

দেশের প্রাচীনতম কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশের মহাসচিব, বর্ষীয়ান আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল বাসেত বরকতপুরী (দা. বা.) বলেন,

"অধমের প্রত্যাশা, সাধারণ জনমানুষ থেকে নিয়ে জ্ঞান তাপস বোদ্ধা মনীষীদেরও আল-আবরারের অতিশয় প্রয়োজন রয়েছে।... মুসলিম জাতির দৈন্যদশায় ইসলামী জ্ঞানের দ্যুতিমান আলোকবর্তিকা রূপে চির সমুজ্জল থাকে।"

বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক ও গবেষক হযরত মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেব বলেন,

"...আমি মাসিক আল-আবরারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টার সুস্থ, দীর্ঘ ও কর্মময় নেক হায়াত। তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজের মধ্য দিয়ে সময়কে জয় করে নিতে পারবেন। যেমন সারা জীবন করে এসেছেন।"

মাসিক আল-আবরারের নববর্ষ সংখ্যাটি এমন সময় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যখন দেশের পরিস্থিতি খুবই নাজুক। যার করাল গ্রাসে স্তব্ধ দেশের প্রতিটি গণমানুষ। এমতাবস্থায় নববর্ষ সংখ্যা হিসেবে বর্ধিত কিছু করার চিন্তা থাকলেও তা আমরা করতে পারিনি। এর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৫/০১/২০১৫

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো। (আরাফ ১৯৯)

আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়াতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে করীম (সা.) কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

এতে তিনটি বাক্য রয়েছে। خذ العفو আরবী অভিধান মোতাবেক عفو এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং সবকটি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলিমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হলো, عفو বলা হয়, এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোনো রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না, বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে, আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এ জন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব এ আয়াতে রাসূলে কারীম (সা.) কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না। বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত যাকাত, রোযা, হজ এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ বুখারী শরীফেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে উল্লিখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব। (ইবনে কাসীর)

তাফসীর শাস্ত্রের ইমামদের এক বিরাট জমাআত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটি উল্লিখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলিমদের একদল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছে যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ইবনে জরীর (রা.) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সা.) হযরত জিবরাঈল (আ.) কে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সা.) কে জানান যে এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে] নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায় অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়াহ (রা.) সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর রেওয়াতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.) কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সা.) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রা.)-এর সাথে এমন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়, বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

এ বিষয়ের সমর্থন সে হাদীসেও পাওয়া যায়, যাতে ইমাম আহমদ উকবাহ (রা.) ইবনে আমের (রা.)-এর রেওয়ায়াত থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁদেরকে অর্থাৎ সাহাবীদের মহানবী (সা.) যে মহান চরিত্রের প্রশিক্ষণ দান করেছেন তা ছিল এই যে, তোমরা সে লোককে ক্ষমা করে দাও, যে তোমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, যে লোক তোমাদের সাথে সম্পর্কছেদ করে, তোমরা তার সাথে মেলামেশা করতে থাকো এবং যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে, তাকে দান-খয়রাত করো।

হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়াতক্রমে ইমাম বায়হাকী (রহ.) উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ

করেছেন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের স্বভাব-চরিত্র অপেক্ষা উত্তম স্বভাব ও চরিত্রের শিক্ষা দিচ্ছি। তা হলো এই যে, যে লোক তোমাদের বঞ্চিত করে তোমরা তাকে দান করো, যে লোক তোমাদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তোমরা তাকে ক্ষমতা করে দাও, যে তোমাদের সাথে সম্পর্কছেদ করে তোমরা তার সাথে মেলামেশা করো।

عـــفـــو শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় অর্থের মূল বক্তব্যই এক। তা হলো এই, মানুষের হালকা ও অগভীর আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীকে গ্রহণ করে নিন। অধিকতর যাচাই অনুসন্ধানের পেছনে পড়বেন না এবং তাদের কাছ থেকে অতি উচ্চস্তরের আনুগত্যও কামনা করবেন না। তাছাড়া তাদের ভুলভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাবেন না। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর কাজকর্ম ও মহান স্বভাব সর্বদা এ ছাঁচেই ঢেলে সাজানো ছিল। আর তারই বিকাশ ঘটেছিল সে সময়, যখন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর শত্রুরা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে হাজির হয়েছিল। তখন তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিশোধ তো দূরের কথা, আজ আমি তোমাদের বিগত দিনের আচার-ব্যবহারের জন্য তোমাদের ভর্ৎসনাও করছি না।

وأمــر بـالعـرف এখানে عـرف বলা হয় যেকোনো ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয় বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

واعــرض عـن الـجـهلين এর অর্থ হলো, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের বা প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে, যারা এমন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না, বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের মানুষের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথাবার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মতো ব্যবহার আপনিও করবেন না। বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন। তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই যে, তাদের হিদায়াতও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব এবং মর্যাদার পরিপন্থী।

সহীহ বুখারীতে এ ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইববে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ফারূকে আজম (রা.)-এর খিলাফত আমলে উয়ায়নাহ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন সেই সমস্ত বিজ্ঞ আলিমের একজন, যাঁরা হযরত ফারূকে আজম (রা.)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়ায়নাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল, তুমি তো আমীরুল মুমিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক। আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়েস (রা.) ফারূকে আযম (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়ায়নাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিলেন।

কিন্তু উয়ায়নাহ ফারূকে আযম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, 'আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।' হযরত ফারূকে আযম (রা.) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হযরত ইবনে কায়েস নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মুমিনীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, خـذ الـعـفـو وأمـر بالعرف واعــرض عـن الـجـهـلـين আর এই লোকটিও জাহিলদের একজন। এই আয়াত শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোনো কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিল–

كان وقافا عند كتاب الله عزوجل

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

মোট কথা হলো, আয়াতটি বলিষ্ঠ ও সৎচারিত্রিকতা সম্পর্কে একটি অতি ব্যাপক আয়াত। কোনো কোনো আলিম এর সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে মানুষ দুই রকম। এক. সৎকর্মশীল এবং দুই. অসৎকর্মশীল। এই আয়াত উভয় শ্রেণীর সাথেই সদ্ব্যবহার করার হিদায়াত দিয়েছে যে, যারা নেক কাজ করে তাদের বাহ্যিক নেকীকে কবুল করে নাও, তাদের ব্যাপারে বেশি তদন্ত অনুসন্ধান করতে যেও না কিংবা অতি উচ্চমানের সৎকর্ম তাদের কাছে দাবি করো না, বরং যতটুকু সৎকর্ম তারা সহজভাবে করতে পারে তাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করো। আর যারা বদকার বা অসৎকর্মী তাদের ব্যাপারে এ আয়াতের হিদায়াত হলো এই যে, তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষদান করো এবং কল্যাণের পথপ্রদর্শন করতে থাকো। যদি তারা তা গ্রহণ না করে নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রান্তিতে আঁকড়ে থাকে এবং মূর্খজনোচিত কথাবার্তা বলতে থাকে, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তাদের সেসব মূর্খতাসুলভ কথার কোনো উত্তরই দেবে না। এতে হয়তো বা কখনও তাদের চেতনার উদয় হবে এবং নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে।

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২

গত সংখ্যায় এই লেখার ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থটি একটি মাত্র কিতাব নয় বরং কয়েকটি কিতাবের একত্রিত রূপ। আমরা সর্বপ্রথম ফাজায়েলে যিকির নিয়ে কাজ আরম্ভ করছি।

এই কাজে আমরা যে নিয়ম অনুসরণ করেছি তা হলো ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নাম্বার হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হবে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হবে।

তাখরীজের ক্ষেত্রে সিহাহে সিত্তার কিতাবগুলোর হিন্দি নুসখার (ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার দেওয়া হবে এবং হাদীস নাম্বারের ক্ষেত্রে আরবী প্রকাশনাগুলো অনুসরণ করা হবে। অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা ও খণ্ড লেখার পাশাপাশি হাদীস নাম্বারও উল্লেখ করা হবে।

তাহকীকের ক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, যে সকল হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি (বুখারী+মুসলিম) এবং বুখারী বা মুসলিমের হাদীস সেগুলোর কোনো হুকুম লাগানো হবে না। কারণ সেগুলো সবই সহীহ। বাকি হাদীসগুলোতে বিশেষভাবে তাহকীক করার পর হুকুমটিই শুধুই উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ফাজায়েলে যিকির :

হাদীস নং ১।

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله ﷺ يقول اللهُ تعالَى : أنا عندَ ظنِّ عبدِي بى ، وأنا معه إذا ذكَرَنِى ، فإن ذَكَرَنِي فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكَرَنِى فى ملا ذكرته فى ملاَ خيرٌ منهم ، وإن تقرَّبَ إلىَّ شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعًا ، وإن تقرَّبَ إلىَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا ، وإن أتانى يمشى أتيتُه هرُولة

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (হাদীসে কুদসী) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি বান্দার সাথে ওই রূপ ব্যবহার করে থাকি, যেরূপ সে আমার সাথে ধারণা রাখে। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি। অতএব সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোনো মজলিসে আমার যিকির করে তবে আমি ওই মজলিস হতে উত্তম (অর্থাৎ নিষ্পাপ ফেরেশতাদের) মজলিসে তার আলোচনা করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসতে থাকে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

(বুখারী শরীফ ২/১১০১ হা. ৭৪০৫, মুসলিম শরীফ ২/৩৪০ হা. ২৬৭৫, তিরমিযী শরীফ ২/২০১ হা. ৩৬০৩, সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ ৪/৪১২ হা. ৭৭৩০, মুসনাদে আহমদ ২/২৫১ হা. ৭৪৪০)

হাদীসের উল্লিখিত ইবারত মুসলিম শরীফের।

উল্লিখিত হাদীসের সাথে মুসনাদে বাযযারের একটি রেওয়ায়াত আনা হয়েছে–

عنِ عبد الله ابن عباس قالِ اللهُ تبارك و تعالَى : يا ابنَ آدمٍ إذا ذكرُتَنى خالِيًا ، ذكرتُك خاليًا ، و إذاذكرُتَنى فى ملاَ ، ذكرتُك فى ملاَ خيرٍ من الذين تذكرُنى فيهم-

(মুসানাদে বাযযার [কাশফুল আসতার] হা. ৩০৬৫, ইবনে মাজাহ ১/২৬৮, ইবনে হিব্বান ৩/৯৭ হা. ৮১৫, মুসলিম শরীফ ২/৩৪৩ হা. ৬৭৭৪, বুখারী শরীফ ২/১১২৫ তালীকান সূত্রবিহীন)

হাদীসটি সহীহ। হাফেজ মুনযিরী (তারগীব ২/২৫২) হায়সামী (মজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৮)

(ক) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উর্দূতে আরেকটি হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক নওজোয়ান সাহাবীর মৃত্যুশয্যায় তার নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থায় আছো? সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রহমতের আশা রাখি এবং নিজের গোনাহের কারণে ভয়ও

করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, এরূপ অবস্থায় যার অন্তরের মধ্যে এই দুটি বস্তু থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার আশাকৃত বস্তু দান করেন এবং ভয় হতে তাকে নিরাপত্তা দান করেন।

হাদীসটির মতন/মূলপাঠ নিম্নরূপ–

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخل على شابٍّ وهو فى الموتِ فقال كيف تجدُكَ ؟ قال :واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنى أرجو اللهَ، وإنى أخاف ذنوبى .فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :لا يجتمعان فى قلبِ عبدٍ فى مثلِ هذا الموطنِ، إلا أعطاه اللهُ ما يرجو، وآمنهُ مما يخافُ

(সুনানে তিরমিযী ১/১৯২ হা. ৯৮৩, ইবনে মাজাহ ৩১৪ হা. ৪২৬১, হিলয়াতুল আউলিয়া ৬/২৯২)

হাদীসটি হাসান। ইমাম তিরমিযী (তিরমিযী ১/১৯২), হাফেজ মুনযিরী (তারগীব ৪/১৩৫)

(খ) উর্দূতে তিনি আরেকটি হাদীসের অর্থ লেখেন, যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

এক হাদীসে এসেছে, "মুমিন বান্দা আপন গোনাহকে এই রূপ মনে করে, যেন সে একটি পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর পাহাড়টি তার ওপর ভেঙে পড়ার আশংকা। অন্যদিকে ফাসেক ব্যক্তি গোনাহকে এরূপ মনে করে, যেন তার ওপর একটি মাছি বসল আর একে তাড়িয়ে দিল।"

এই হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عن عبد الله بن مسعودؓ عنه موقوفا قال: ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا

(বুখারী ২/৯৩৩ হা. ৬৩০৮, তিরমিযী ২/৭৬ হা. ২৪৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

আলোচ্য হাদীসটির মতন বুখারী শরীফের। তবে তিরমিযী শরীফে হাদীসটির শেষে فطار শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। যার দ্বারা উর্দূতে লেখা হাদীসের মর্ম স্পষ্ট হয়।

(গ) "হযরত মাআয (রা.) প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময় তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলেন। কখনও হুঁশ ফিরে এলে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মুহাব্বত করি। আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার এই মহব্বতের বিষয় আপনার জানা আছে। যখন মৃত্যু একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেল তখন বললেন, ওহে মৃত্যু! তোমার আগমন শুভ হোক। কতই না মোবারক মেহমান আগমন করেছে; কিন্তু এই মেহমান অনাহার অবস্থায় এসেছে। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি সর্বদা আপনাকে ভয় করেছি। আর আমি আপনার কাছে রহমতের আশাবাদী। হে আল্লাহ! আমি জীবনকে মহব্বত করেছি, কিন্তু তা নহর খনন করার জন্য অথবা বাগান তৈরি করার জন্য নয়; বরং গরমে (রোযা রেখে) পিপাসার কষ্ট সহ্য করার জন্য, দ্বীনের খাতিরে দুঃখ কষ্ট বরদাশত করার জন্য এবং যিকিরের মজলিসে ওলামায়ে কেরামের নিকটে জমে বসার জন্য।

এটি নিম্ন হাদীসের মর্মার্থ :

عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ من احسن الناس وجها وخلقا واسمهم كفا، ولما وقع الطاعون بالشام قال معاذ اللهم ادخل على آل معاذ نصيبهم من هذا، فطعنت له امرأتان فماتتا ثم طعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم طعن معاذ فجعل يغشى عليه فاذا افاق قال: رب غمك فوعزتك انك تعلم انى احبك ، ثم يغشى عليه، فاذا افاق قال مثله ولما حضرته الوفاة قال: مرحبا بالموت مرحبا زائر حبيب جاء على فاقة، اللهم انك تعلم انى كنت اخافك وانا اليوم ارجوك انى لم اكن احب الدنيا، وطول البقاء فيها لكرى الانهار ولا نعرس الاشجار ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر۔

হাদীসটির সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তাই হাদীসটি সহীহ। (তাহযীবুল কামাল ২৭/২৯৮, ১২/৩৮২)

(ঘ) অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে, বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ কথা না বলে যে, আমার দু'আ কবুল হয় না।

عن ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ قال: يستجاب لاحدكم مالم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي

(বুখারী ২/৯৩৮ হা. ৬৩৪, মুসলিম ২/৩৫২ হা. ২৭৩৫, সুনানে আবী দাউদ ১/২১৫ হা. ১৪৮৪, তিরমিযী ২/১৭৬ হা. ৩৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৭৪ হা. ৩৮৫৩)

হাদীসটি সহীহ। (তিরমিযী ২/১৭৬) বুখারী মুসলিমে তো আছেই।

(ঙ) হাদীস শরীফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে লোকদের নিকট বলে বেড়ায় তার সচ্ছল অবস্থা নসীব হয় না। কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আকুতি মিনতি ও দু'আ করে তবে অতি সত্বর এই অবস্থা দূর হয়ে যায়।

من اصابته فاقته فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله اوشك الله له بالغنى : اما بموت عاجل او غنى عاجل

(সুনানে আবী দাউদ ১/২৩২ হা. ১৬৪৫, তিরমিযী ২/৫৮, ২৩২৬, মুসনাদে আহমদ ১/৩৮৯ হা. ৩৬৯৫, তাবরানী কবীর ১০/১৫ হা. ২৭৮৫, বায়হাকী কুবরা ৪/১৯৬ হা.

৭৮৬৯)
হাদীসটি সহীহ। (তিরমিযী ২/৫৮)

হাদীস ২।

عـن عبد الله بن بسر ان رجلا قال يارسول الله ان شرائع الاسـلام قـد كثـرت عـلـى فـاخبـرنى بشئ استن به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) হতে বর্ণিত, একজন সাহাবী (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীয়তের হুকুম আহকাম তো অনেক রয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যার ওপর আমি সব সময় আমল করতে পারি এবং তাতে মশগুল থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহর যিকির দ্বারা তুমি তোমার জিহ্বাকে সর্বদা ভিজিয়ে রাখো।

(মুসনাদে আহমদ ৪/১৮৮ হা. ১৭৬৯৭, তিরমিযী ২/১৭৫ হা. ৩৩৭৫, ইবনে মাজাহ ২৬৮ হা. ৩৭৯৩, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৫ হা. ১৮২২, বায়হাকী (কুবরা) ৩/৫১৯ হা. ৬৫২৬, ইবনে আবী শায়বা ২৯৪৪৪)

হাদীসটি সহীহ। (মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৪৯৫)

عـن مـالك بـن يـخـامر ان معاذ بن جبل قال لهم ان اخر كـلام فـارقـت عليه رسول الله ﷺ ان قلت اى الاعمال احـب الى الله قال ان تموت ولسانك رطب من ذكر الله ۔

আরেক হাদীসে আছে, হযরত মু'আয (রা.) বলেন, বিদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমার সর্বশেষ কথা এই হয়েছিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এমন অবস্থায় যেন তোমার মৃত্যু হয় যে, আল্লাহর যিকিরে তোমার জিহ্বা তরতাজা থাকে।

(সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১০০ হা. ৮১৮, তাবরানী কাবীর ২০/১০৭ হা. ২১২, আমালুল লায়লি ওয়াল ইয়াওমি ইবনে সুন্নী পৃ. ৬ হা. ২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪ হা. ১৬৭৪৭)

হাদীসটি সহীহ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৭৪)

(ক) অন্য হাদীসে এসেছে, চারটি জিনিস এমন আছে, যে ব্যক্তি ওই গুলোকে হাসিল করতে পারবে সে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ হাসিল করতে পারবে। এক. এমন জিহ্বা, যা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। দুই. এমন দিল, যা সর্বদা আল্লাহর শোকরে মশগুল থাকে। তিন. এমন শরীর, যা কষ্ট সহ্য করতে পারে। চার. এমন স্ত্রী যে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে এবং স্বামীর সম্পদে খিয়ানত করে না।

হাদীসটির মূল ইবারত নিম্নরূপ :

ان رسـول الله ﷺ قال : اربع من اعطيته فقد اعطى خير الـدنيـا والآخرة قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا وبدن على البلا صابر وزوجة لا تبغيه خوفا فى نفسها ولا ماله۔

(তাবরানী [কাবীর] ১১/১৩৪ হা. ১১২৭৫, শুআবুল ঈমান বায়হাকী ৪/১০৪ হা. ৪৪২৯, মুযামুল আওসাত ৭/২২৩ হা. ৭২১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২৭৩ হা. ৭৪৭)

হাদীসটি হাসান। (ফয়জুল কাদীর ২/৯১৩, তারগীব ২/৫৫৬)

(খ) এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহর সাথে মুহব্বতের আলামত হলো তাঁর যিকিরকে মহব্বত করা, আর আল্লাহর সাথে বিদ্বেষের আলমত হলো তাঁর যিকিরের সাথে বিদ্বেষ রাখা।

উক্ত হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عـن انس بن مالكؓ قال: سمعت النبى ﷺ يقول: علامة حب الله ذكر الله وعلامة بغض الله بغض ذكر الله

(শুআবুল ঈমান বায়হাকী ১/৬৭ হা. ৪১০, কানযুল উম্মাল ১৭৭৬,বাহরুল ফাওয়ায়েদ ১/২২, মু'জামে ইবনে মুকরী হা. ৯৪৬, আমালী ইবনে বুশরান ১/৩২৩ হা. ১৬০৯ [হাসান])

(গ) হযরত আবু দরদা (রা.) বলেন, যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা তাজা থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসটির মতন নিম্নরূপ :

عـن ابـى الـدرداءؓ مـوقـوفـا قال: ان الذين لاتزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهو يضحكون۔

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১০/৩০৩ হা. ৩০০৭২, কানযুল উম্মাল ১/৪২৭ হা. ১৮০৯, জামেউস সগীর ওয়া যাওয়ায়িদিহী জামেউল আহাদীস ৫/৫১২)

সহীহ। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভরযোগ্য। (তাহযীবুল কামাল ১০/৪০)

হাদীস ৩।

عـن ابـى الـدرداءؓ قال قال رسول الله ﷺ الا انبيكم بخير اعـمـالـكـم وازكاها عند مليككم وارفعها فى درجاتكم وخيـرلـكـم مـن انـفـاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلىٰ قال ذكر الله۔

একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে উদ্দেশ করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস বলে দেব না, যা সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের পরোয়ারদিগারের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্তবাকে অনেক বেশি বুলন্দকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রুপা খরচ করা হতেও বেশি দামি এবং জেহাদের ময়দানে তোমাদের দুশমনকে কতল করো আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে তা থেকেও বেশি উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, অবশ্য বলে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তা হলো আল্লাহর যিকির।

(মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৫ হা. ২১৭৬০, সুনানে তিরমিযী ২/১৬৬ হা. ৩৩৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ ২৬৮ হা. ৩৭৯০, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৯৫ হা. ১৮২৫, শুআবুল ঈমান বায়হাকী ১/৩৯৪ হা. ৫১৯)

ইমাম হাকেম ও যাহাবী (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (মুসতাদরাক ১/৪৯৬)

عن ابى سعيد سئل رسول الله ﷺ اى العباد افضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثير ا قلت يارسول الله ومن الغازى فى سبيل الله قال لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله افضل من درجة۔

(মুসনাদে আহমদ ৩/৭৫ হা. ১১৭২৬, সুনানে তিরমিযী ২/১৭৫ হা. ৩৩৭৬, শুআবুল ঈমান বায়হাকী ১/৪১৯ হা. ৫৮৯ [হাসান লি শাওয়াহিদিহী])

(ক) এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করার এবং এর ময়লা দূর করার বস্তু আছে। (যেমন কাপড় ও শরীরের জন্য সাবান, লোহার জন্য আগুনের ভাঁট্টি ইত্যাদি) আর অন্তরসমূহের ময়লা দূরকারী হলো আল্লাহ তা'আলার যিকির।

হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عن عبد الله بن عمرؓ عن النبى ﷺ انه يقول ان لكل شئ صقالة وان صقالة القلوب ذكر الله۔

(শুআবুল ঈমান বায়হাকী ১/৩৯৬ হা. ৫২২, কনযুল উম্মাল ১/৪১৮ হা. ১৭৭৭)

এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

(খ) হযরত সালমান ফারসী (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন শরীফ পড়োনি? পবিত্র কুরআনে আছে, ولذكر الله اكبر আল্লাহর যিকির হতে শ্রেষ্ঠ কোনো জিনিস নেই।

হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عن سلمانؓ انه سئل اى العمل افضل ؟ قال اما تقرأ القرآن "ولذكر الله اكبر"(عنكبوت ٤٥) لاشئ افضل من ذكر الله۔

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১৫/৫৬৭ হা. ৩০৯৩৯, তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী ১০/১৪৭ হা. ২৭৮০৮, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৮৩ [সহীহ])

(গ) এক হাদীসে এসেছে, "এক মুহূর্ত ফিকির করা ৬০ বৎসর ইবাদত হতে উত্তম।"

হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عن ابى هريرةؓ عن النبى ﷺ فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة۔

(ইবনে হিব্বান ১/২ হা. ৪২, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য)

(ঘ) হযরত সাহাল (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর যিকিরের সওয়াব এত বেশি যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচের চেয়ে সাত লক্ষ গুণ বেশি হয়ে যায়।

হাদীসের মতন নিম্নরূপ :

عن سهل بن معاذ بن انس الجهنى عن ابيه قال: قال رسول الله ﷺ بفضل الذكر على النفقة فى سبيل الله تبارك تعالى بسبع مأة الف ضعفا۔

(সুনানে আবী দাউদ ১/৩৩৮ হা. ২৪৯৮, মুসনাদে আহমদ ৩/৪৪০ হা. ১৫৬৫৩, মুজামুল কাবীর ২০/১৮৫ হা. ৪০৫, হাকেম ২/৮৮ হা. ২৪১৫, বায়হাকী ৯/২৯০ হা. ১৮০৭৪)

হাদীসটি সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৮৮)

(ঙ) এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, সামান্য সময় আল্লাহর পথে দাঁড়িয়ে থাকা সত্তর বৎসর ঘরে নামায পড়া হতে উত্তম।

ان مقام احدكم فى سبيل الله افضل من صلاته فى بيته سبعين عاما۔

(সুনানে তিরমিযী ১/২৯৪ হা. ১৬৫০, মুসনাদে আহমদ ২/৫২৪ হা. ১০৭৯৬, হাকেম ২/৬৮ হা. ২৩৮২, বায়হাকী ৯/২৭০ হা. ১৮০৩)

হাদীসটি সহীহ। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৬৮) ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় সহীহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা
শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর
অমূল্য বাণী

যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে

মানুষ কোনো কাজ আরম্ভ করলে প্রথমে শক্তি-সামর্থ্য কম থাকে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। যে শিশু প্রথম সবক আরম্ভ করার সময় একটা হরফ পড়তেও কষ্ট হতো কিছুদিন পর সে শিশু কয়েক হাজার শব্দ এক বৈঠকে পড়তে পারার মতো যোগ্য হয়ে ওঠে। শুধু পড়েই না বরং হাজার শব্দ তার মুখস্থও হয়ে যায়। মানুষের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একই কথা। যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ঈর্ষা করার ক্ষতি

মানুষ চাইলে সৎকাজ ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে। প্রয়োজনে প্রতিযোগী মনমানসিকতা রাখতে পারে। কিন্তু কারো ভালো কাজ দেখে নিজের অন্তরে জ্বালাপোড়া হয় তবে বুঝতে হবে এটি একটি রোগ, এটি ঈর্ষা। কারো দ্বীনি উন্নতি, আর্থিক বা জাগতিক অন্যান্য বিষয়ে অগ্রগতি দেখে যদি অন্তরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয় তা হাসাদ বা ঈর্ষা। কিন্তু এর চিকিৎসা কী? ঈর্ষা থেকে মুক্তির বিভিন্ন উপায় আছে। একটি খুব উন্নত পদ্ধতি আছে, যার ওপর আমল করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। ১। যার প্রতি ঈর্ষা হচ্ছে তাকে আগে সালাম করা। ২। সফরে আসা-যাওয়ার সময় তার সাথে মোসাফাহা করা। ৩। তার জন্য হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসা। ৪। তাকে দাওয়াত দেওয়া। ৫। উক্ত ব্যক্তির জন্য নিয়ামত বৃদ্ধির দু'আ করা। ৬। তার প্রশংসা করতে থাকা। ৭। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন আমি যদি তার নিয়ামত চলে যাওয়া কামনা করি তবে তা হবে স্বয়ং আল্লাহর সাথে মোকাবিলা। এটি বড়ই ভয়ানক বিষয়। এটা চিন্তা করা।

মোট কথা হলো, হাসাদ থেকে বেঁচে থাকা অতীব প্রয়োজন। আগুন যেমন লাকড়িকে বিনাশ করে, হাসাদও নিজের আমলকে নষ্ট করে। হাসাদ ভয়াবহ একটি রোগ। এই রোগ থেকে মুক্তির যে পদ্ধতি বলা হলো এর উপর সাহসিকতার সাথে আমল করলে ইনশাআল্লাহ এই রোগ সেরে যাবে।

কুরআন তিলাওয়াতের পর দু'আ কবুল হয় :

এ কথা তো প্রসিদ্ধ আছে এবং সকলে জানে যে, পবিত্র কুরআন খতমের পর দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। কুরআন তিলাওয়াত করলেও দু'আ কবুল হয়। (তিরমিযী) বিষয়টি কম লোকই জানেন। এক রুকু বা কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এবং তিলাওয়াত শেষে দু'আ করুন।

প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখা আবশ্যক

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মুসলমান সে ব্যক্তি যার মাধ্যমে কারো কষ্ট না পৌঁছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের একটি দুর্বলতা লক্ষ করা যায়, তা হলো আমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজন এবং পরিবার-পরিজনের প্রতিই মূলত খেয়াল রাখি। প্রতিবেশী বা অন্য মুসলমানদের সুখে খোঁজখবর নিই না। ইসলামের শিক্ষা হলো অন্যের কল্যাণের ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের বেশি বেশি খেয়াল রাখবই সাথে সাথে প্রতিবেশী, দূরাত্মীয় এবং সাধারণ মুসলমানদেরও সুখে-দুঃখে খেয়াল রাখতে হবে। নিজের অধীনস্তদের ওপর এমন বোঝা আরোপ করব না, যা তাদের ক্ষমতার বাইরে। অন্য প্রাণীদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হলো তাদের গালি দিও না, তাদের এমন বোঝা আরোপ করো না, যা তাদের ক্ষমতার বাইরে। যেখানে অন্যান্য প্রাণীর ব্যাপারে ইসলাম এই নির্দেশ দেয়, সেখানে মানুষের ব্যাপারে এসব বিষয়ে কিরূপ খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকে তা অনুমান করা যায়।

দ্বীনি বিধানগুলোও সক্ষমতা পরিমাণ

কেউ ট্রাক বানায়, কেউ কার বানায়। সেগুলো বানানোর সময় উক্ত গাড়ির সক্ষমতার কথা বিবেচনায় রাখে। তাই গাড়ির ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয় এটি এত পরিমাণ বোঝা বহনযোগ্য এবং চলন ক্ষমতা এটুকু। এর বাইরে চালালে বা বেশি বোঝা তার ওপর উঠিয়ে দিলে তখন উক্ত গাড়ি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেখা গেল মানুষ যে মেশিন তৈরি করছে তাতে সক্ষমতার পরিমাণ নির্ণয় করে দেওয়া হয়। এই পরিমাণের বাইরে গেলে বিপদ। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের জন্য যেসব বিধান তিনি দান করেছেন সেগুলোতে সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে দিয়েছেন। এমন কোনো বিধান তিনি মানুষকে দান করেননি, যা তার ক্ষমতার বাইরে। আমাদের সন্তানরা আমাদের কাছেই বড় হয়। কোনো দুই বছরের শিশুকে আমরা বলি না যে, বালতিটিতে পানি ভরে নিয়ে আসো। কেউ বললে তাকে আহাম্মক ছাড়া কিছু বলা হবে না। কারণ তার ক্ষমতার বিষয় আমরা চিন্তা করি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাও এমন কিছুর নির্দেশ বান্দাদের দেন না, যা পালনে সে অক্ষম।

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো বিষয়ের মুকাল্লাফ বানান না।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে সকল বিধান দিয়েছেন সবই মানুষের সামর্থ্যের ভেতরেই আছে। আমরা যদি কোনো কিছু পালন করছি না, সেটা আমাদেরই দুর্বলতা।

মাওয়ায়েযে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

ইহয়ায়ে সুন্নাত ইজতিমায় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বয়ান থেকে সংগৃহীত

সুন্নাতের অনুসরণই কামিয়াবীর একমাত্র পথ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد: فعن عمر بن الخطابؓ عن النبى ﷺ انه قال: انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوىٰ رواه البخارى

নিয়ত আলোচনার বিষয় নয়

নিয়ত সম্পর্কিত এ হাদীসটি আমাদের সকলের জানা এবং বোধগম্যও বটে। কিন্তু লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন শুধুমাত্র একজন সাহাবী। তিনি হলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। আর অসংখ্যা তাবেঈনের মধ্য হতে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনাকারী তাবেঈর সংখ্যাও একজন। তিনি হলেন হযরত আলকামা বিন ওয়াক্কাস আল-লাইছি (রহ.)। এ হাদীসটির বেলায় এমনটি কেন হলো? অন্য ক্ষেত্রে তো সচরাচর এমনটি দেখা যায় না! এর মূলে দুটি কারণ হতে পারে–

১. নিয়ত পরস্পরের মধ্যে আলোচনার জিনিস নয়। তাই নিয়তসংক্রান্ত হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা ব্যাপক নন। তবে যেসব হাদীসের মর্ম আলোচনার দাবি রাখে সেসব হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা ও অসংখ্য।

২. এটাও হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম নিয়ত ও ইখলাসের ওপর মুজাহাদা করে চূড়ান্তভাবে কামিয়াব হয়ে গেছেন। যার কারণে তাঁদের সমস্ত আমল আল্লাহর নিকট মকবুল হয়েছে। যেহেতু নিয়ত ও ইখলাসবিহীন তাদের থেকে কোনো আমলের অস্তিত্ব নেই তাই তাঁদের মধ্যে নিয়তের ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজন কিসের?

নিয়তের আলোচনা এ যুগে

তবে আমাদের মুরুব্বীরা নিয়তের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। বর্তমানেও এ বিষয়ে আলোচনা ব্যাপকহারে হচ্ছে। কারণ হলো, আমাদের কথা ও কাজে মিল নেই। আমল ও নিয়তের মধ্যে সামঞ্জস্যতা নেই। এতদুভয়ের মধ্যে কতটুকু মিল রয়েছে তা পরখ করার জন্যই নিয়তের ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন।

নিয়ত দুরস্ত হবে সুন্নাতের অনুসরণে

নিয়ত ও আমলের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধানকারী একমাত্র পথ ও পন্থা হলো সুন্নাতের অনুসরণ। আমরা যেহেতু সুন্নাত মুতাবেক জীবন যাপন করি না তাই আমাদের আমল ও নিয়তের মধ্যে মিল নেই। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আমাদের মুরুব্বীরা একেকজনে একেক পদ্ধতিতে সুন্নাতের প্রতি জোর দিয়েছেন। আমাদের সর্বশেষ মুরুব্বী হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.) অতি সংক্ষেপে ও ছোট ছোট বাক্যে সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করতেন। যেমন তিনি বলতেন–

آپ لوگ مدرسے کو سنی بنائیں، مساجد کو سنی بنائیں

অর্থাৎ আপনারা মাদরাসা ও মসজিদের পরিবেশকে সুন্নাত মুতাবেক গড়ে তুলুন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, নামায সুন্নাত মুতাবেক আদায় করা, আযান সুন্নাত মুতাবেক দেয়া এবং মসজিদের পরিপূর্ণ আদব বজায় রাখা। আর মাদরাসার ছাত্র-উস্তাদ সকলেই সুন্নাত মুতাবেক জীবনযাপনের প্রতি মনোনিবেশ করা। তাই তো হযরত (রহ.)-কে দেখা যায়, 'দাওয়াতুল হক' শব্দটি ব্যবহার করলে ও 'ইহইয়ায়ে সুন্নাত' শব্দটি বেশি ব্যবহার করতেন। কারণ আমলের মাধ্যমে সুন্নাতকে জিন্দা করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ত দুরস্ত হয়ে যাবে।

যে আমলে নিয়তের প্রয়োজন নেই

যাবতীয় সুন্নাতকে ব্যক্তিজীবনে বাস্তবায়ন করার সহজ উপায় ও উলামায়ে কেরাম বলে দিয়েছেন। সেটা হলো, তিনটি সুন্নাতের ওপর আমল করতে পারলে অন্যান্য সুন্নাতের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে। তন্মধ্যে একটি হলো, ব্যাপকহারে সালামের প্রচার-প্রসার করা। কাউকে সালাম দেয়া কঠিন কাজ নয়, আবার এর জন্য নিয়তের ও দরকার নেই। নিয়ত লাগে না এমন একটি আমল বেশি বেশি করেন, দেখবেন নিয়তের প্রয়োজন হয় এমন অন্যান্য সুন্নাতের প্রতি আপনি অনুরাগী হয়ে যাবেন এবং তার ওপর আমল করা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর নিয়ত ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধন হবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা

ইলমে দ্বীন খুব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই। পাঠ্যসূচিতে যেসব বিষয়ের কিতাব রয়েছে সবই পড়তে হবে। যেমন, হাদীসের কিতাব পড়তে হবে, তাফসীরে কিতাব পড়তে হবে, ফিকহের কিতাব পড়তে হবে, ইলমে নাহু-ইলমে ছরফের কিতাব পড়তে হবে। সাথে সাথে আমাদেরকে ইলমে মানতিকের কিতাবও পড়তে হবে। এমনকি علم الهيئة (জ্যোতির্বিদ্যা) মহাকাশ সম্পর্কে জ্ঞানও লাভ করতে হবে। যদি এ বিষয়ে পড়ালেখা না করেন তাহলে কুরআন বুঝবেন কিভাবে? দেখুন সূরা ইয়াসিনের

৩৭ নং আয়াত থেকে ৪০ নং আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ করেন–

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(٤٠)

অর্থাৎ তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হলো রাত, যা থেকে আমি দিনের আবরণ সরিয়ে নেই। অমনি তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সূর্য আপন গন্তব্যের দিকে পরিভ্রমণ করছে। এসবই ওই সত্তার স্বীকৃত ব্যবস্থাপনা যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ। জ্ঞান ও পরিপূর্ণ। আর চাঁদের জন্য আমি মঞ্জিল নির্দিষ্ট করেছি পরিমাপ করে। পরিশেষে তা যখন ফিরে আসে তখন খেজুরের পুরনো ডালার ন্যায় (সরু) হয়ে যায়। সূর্য পারে না চাঁদকে ঘিরে ধরতে। আর রাতও পারে না দিনকে অতিক্রম করতে। প্রত্যেকেই আপন-আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

একটু ভেবে দেখুন! মহাকাশ বিজ্ঞান না পড়লে এই আয়াতগুলোর মর্ম বোঝাবেন কীভাবে? এত গেল মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে কথা। রইল ভূগোল, হ্যাঁ, আপনাকে ভূগোলও পড়তে হবে। আরো পড়তে হবে علم الطب অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যা। হাদীসের প্রায় কিতাবে একটি অধ্যায় রয়েছে كتاب الطب অর্থাৎ চিকিৎসার অধ্যায় নামে। এ অধ্যায়ে যত হাদীস বর্ণিত আছে সবই তো রাসূল (সা.) হতে। সুতরাং এ বিদ্যাটিতে অপ্রয়োজনীয় বলার কোনো অবকাশ নেই। উলামায়ে কেরামকেও এসব বিষয়ের ওপর পড়ালেখা করতে হবে। কিন্তু আফসোস! আপনারা পাঠ্যসূচি 'হতে মানতিক' যুক্তিবিদ্যা বাদ দিলেন। فلسفه বিজ্ঞান বাদ দিলেন। علم الهيئة মহাকাশ বিজ্ঞান বাদ দিলেন। আরো বাদ দিয়েছেন ভূগোল, হিসাববিজ্ঞান এবং علم الطب চিকিৎসাবিদ্যা। এভাবেই একের পর একটি বিষয় বাদ দিয়েই যাচ্ছেন। বলুন তো! পাঠ্যসূচিতে রাখলেন কী? আরে ভাই! যা রাখা হয়েছে তার মধ্যে হতে জরুরি কিতাবগুলোও তো পড়ানো হচ্ছে না ভালো করে! এসব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে গত তিন বছর পূর্বে 'জামি'আতুল আবরার বসুন্ধরা রিভারভিউ'তে একটি জামাত-ক্লাস খুলেছি, এই জামাতের পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোট ১৫টি কিতাব পড়ানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ। যারা পড়ছে তারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে বলেই আমাদের কাছে তাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে।

কলব আলোকিত হয় সুহবতে আহলুল্লাহর দ্বারা

কিতাব পড়াপড়ি করলে দেমাগ আলোকিত হয়। বুঝশক্তি ও যোগ্যতা বাড়ে। উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর কিতাবাদী যারা পড়েছে তাদের দেমাগ স্বচ্ছ আলোকিত এবং তাদের যোগ্যতা অন্যদের তুলনায় বেশি–এটা নির্দ্বিধায় বলা যাবে। কোনো কিছু বুঝতেও তাদের বেগ পেতে হয় না। কিন্তু একজন আলেমের জন্য দেমাগ আলোকিত হলেই চলবে না, তার কলবও আলোকিত (নুরাণী) হতে হবে। আর কলব আলোকিত হবে কোনো আল্লাহওয়ালার সুহবতের মাধ্যমে। কিতাবী ইলম দ্বারা দেমাগ রওশন হলেও কলব রওশন হয় না।

আল্লাহওয়ালার পরিচয়

যিনি সুন্নাতের মুত্তাবে-অনুসরণকারী তিনিই প্রকৃত আল্লাহওয়ালা। এটা কখনো মনে করবেন না যে, ইবাদত বেশি করার নাম আল্লাহওয়ালা! মুরীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার নাম আল্লাহওয়ালা! হাজারী তাসবীহ হাতে নিয়ে বসে থাকার নাম আল্লাহওয়ালা! অতএব যদি কলবকে আলোকিত করতে চান তাহলে একজন মুত্তাবিয়ে সুন্নাতের সুহবতে যান, আপনার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুন্নাত মুতাবেক চলার প্রতি যজবা, আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আরে ভাই! আতরের দোকানে গেলে আতরের ঘ্রাণ পাওয়া যায় কিনতে হয় না, আর কামারের দোকানে গেলে লোহা পোড়ার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করলেও কোনো কাজ হবে না।

সারকথা হলো, আপনি একজন মুত্তাবিয়ে সুন্নাতের সংস্পর্শে যান, নিজেও মুত্তাবিয়ে সুন্নাত হয়ে যাবেন এবং আপনার কলবও আলোকিত হয়ে যাবে আর দেমাগ তো রওশন আছেই। এ দুটির সমন্বয় হওয়ার পর আপনি আল্লাহর মাহবুব হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰه

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহকে পেতে চাও তাহলে আমার (রাসূলের) অনুসরণ করো। তোমরা আল্লাহর মাহবুব প্রিয় হয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান-৩১)

এ ধরনের শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হবেন না যে, আমরা আল্লাহর ওলী হতে পারব না কি? ব্যস! সুন্নাতের অনুসরণ করেন মু'আক্কাদা হোক বা গাইরে মু'আক্কাদা। ইনশাআল্লাহ! আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবেন।

মাদারেস কো-সুন্নী বানাও!

হারদুয়ী হযরত (রহ.) যে বলেছেন مدرسے کو سنی بناؤ এর অর্থ হলো, দরস দান কালে হাদীসের জিবরীলকে সামনে রেখে দরস দান করেন। তাশাহহুদের সুরতে দু'ঝানু হয়ে বসেন, সুন্দর কাপড়, সুন্দর টুপি পরে দাড়ি-চুল পরিপাটি করে বসুন। হেলান দিয়ে, শুয়ে শুয়ে, টুপি খুলে খালি মাথায় চার ঝানু হয়ে বসে পড়াবেন না। এগুলো সুন্নাতের খেলাফ। কোনো ধনাঢ্য এলে তো সেজেগুজে

বসেন! দ্বীনি ইলমের কিতাব, হাদীসের কিতাব, তাফসীরের কিতাব সামনে নিয়ে বসার সময় এমনটা করেন না কেন? এটা কি ইলমে দ্বীনের অবমাননা নয়?

চেয়ারে বসে পড়ানো

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আপনারা চেয়ারে বসে দরস দেবেন না। এটা সরাসরি বেয়াদবির শামিল। শরয়ী মাজুর-অসুস্থ হলে ভিন্ন কথা, তবে কেউ নিজেকে মাজুর বানিয়ে নেবেন না। এ ছাড়া ও দরস দানে আরো বিভিন্ন আদাবের কথা আপনারা তা'লীমুল মুতাআল্লিম' নামক কিতাব পড়েছেন। এগুলোকে বাস্তবিক আমলে রূপান্তরিত করার মাধ্যমেই মাদরাসার পরিবেশ সুন্নী হতে পারে।

মোবাইল ফোন ব্যবহার

মোবাইল ফোন ব্যবহার ওলামায়ে কেরামের জন্য মুবাহ। অর্থাৎ বৈধ কাজে ব্যবহারের অনুমতি আছে। আর ছাত্রদের জন্য ব্যবহার করা জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরনের জঘন্য কাজ একজন ছাত্রের জন্য ঈমান হারানোর কারণও হতে পারে। মোবাইল ব্যবহার করে কবীরা গুনাহ করল, আর এই গুনাহকে কোনো গুনাহই মনে করল না, তাহলে এই মোবাইল তার জন্য ঈমান হারানোর মাধ্যম হিসেবেই পরিগণিত হবে।

অনুরূপভাবে কোনো উস্তাদের মধ্যে যদি ছাত্রদের ন্যায় মোবাইলে অসৎ কাজ করার প্রবণতা থাকে তাহলে ওই উস্তাদ তো দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষক হওয়ারই উপযুক্ত নয়। কোনো উস্তাদ যদি ছাত্র যমানার এ ধরনের বদ্যাভ্যাস নিয়ে শিক্ষক হয়ে থাকে, যা এখনো তার মধ্যে বিদ্যমান, তাহলে আমরা দু'আ করি আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করুন। কপালে হেদায়েত না থাকলে তাকে দ্বীনি মাদরাসা থেকে সরিয়ে দিক। দ্বীনি মাদরাসার জন্য এ ধরনের আলেমের কোনো প্রয়োজন নেই।

ষড়যন্ত্রের জাল

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিজেদের কু-প্রবৃত্তির সাথে মুজাহাদা করে মহা মূল্যবান সময়কে তাঁরই ইবাদতে ব্যয় করার জন্য। তবে পার্থিব প্রয়োজন পূরণার্থে যতটুকু দরকার ততটুকু সময় দুনিয়ার জন্য ব্যয় করা যাবে। সাথে সাথে আমাদেরকে অবশ্যই এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা ইবাদত কিংবা দুনিয়াবী কোনো প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। এ ছাড়া অনর্থক বাজে কাজ ও অবৈধ কাজে সময় নষ্ট করলে আখেরাতে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। আজ আমরা যে পরিবেশে শাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি তা শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জালে আবৃত। অনর্থক বাজে কাজে সময় নষ্ট করার যাবতীয় উপকরণ হাতের নাগালে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। মোবাইল নামক এই ছোট্ট যন্ত্রটি এর অন্যতম। অধিকাংশ মানুষ এর মাধ্যমে অনর্থক বাজে কাজে লিপ্ত। বলুন তো! কোন ধরনের অপকর্ম এর মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে না। ভেবে দেখুন! মহা মূল্যবান সময়গুলো এর মাধ্যমে বিভিন্ন বৈধ-অবৈধ প্রোগ্রামের পেছনে ব্যয় করে আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে নিচ্ছি কিনা? মোবাইলে সংঘটিত গুনাহকে তো আজকাল গুনাই মনে করা হয় না। (নাউযুবিল্লাহ!) অথচ যা হচ্ছে তার অধিকাংশই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন

মোবাইল ফোনে অশ্লীলতা

মোবাইলের মাধ্যমে যেসব গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলোর সংখ্যা কল্পনাতীত। যারা করে তারাই এর সঠিক সংখ্যা বলতে পারবে। মেমোরি ও মোবাইলে মানুষের ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি-ভিডিও সংরক্ষণ করে রাখা হয়। গান-বাদ্যের সাথে তিলাওয়াতের আওয়াজ ধারণ করা হয়। অনৈসলামিক সফটওয়্যারের সাথে কুরআনের সফটওয়্যারও রাখা হয়। আরো শুনেছি, বিভিন্ন অশ্লীল নোংরা সব ছবি ও ভিডিও লোড করে রাখার কথা। ইন্টারনেট চালু করে খোলা হয় হাজারো গুনাহের দরজা। যোগাযোগ মাধ্যম নামের ফেইসবুক-টুইটারে চলে মিথ্যার সয়লাব, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি, অবৈধ-অনৈতিক সম্পর্কের হিড়িক আরো কত কিছু। এসব মাধ্যমগুলোতে যাদেরকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করা হয়, বলুন তো! এরা আখেরাতে আপনার কী কাজে আসবে? নাকি তারা আপনার দ্বীন ঈমান দুনিয়া সব কিছু বরবাদ করে দিচ্ছে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا وَيْلَتٰى لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩)

অর্থাৎ হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমার কাছে তো উপদেশ এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। শয়তানের চরিত্রই তো এমন যে, সে সময়কালে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়। (সূরা ফুরকান-২৮-২৯)

এত গেল কুরআনের ঘোষণা, এবার দেখুন, হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل

অর্থাৎ ব্যক্তি তার বন্ধুর চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং ভালো করে দেখো কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছো? (আবু দাউদ হা. ৪৮৩৩)

আরে ভাই! যারা মোবাইলের ব্যবহার বৈধ-অবৈধ বা শুধুমাত্র অবৈধ ক্ষেত্রেই করে তাদের জন্য তো এই মোবাইল لهو الحديث (দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনকারী)-এর অন্তর্ভুক্ত। এ

ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

অর্থাৎ কিছু মানুষ এমন আছে, যারা না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব কথা খরিদ করে, যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। (সূরা লুকমান-৬)

মোবাইল নামক এই যন্ত্রটির কিছু ভালো দিক থাকলেও ইসলাম দুশমনেরা কিন্তু আকর্ষণীয় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে মুসলিম সমাজকে দ্রুত অতি দ্রুত দ্বীনবিমুখ করে বেঈমান বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং সময় আছে এখনো সাবধান হওয়ার!

অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা

আপনি নিজেকে মুত্তাবিয়ে সুন্নাত-সুন্নাতের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই অনর্থক কথাবার্তা, কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। দেখুন! কুরআন মানুষকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করার পথ বাতলে দিয়েছে এবং ওই সব পথ ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছে, যা মানুষের জন্য অপমান, অধঃপতন, ক্ষতিসাধন হওয়ার কারণ ও অলাভজনক হয়। এ মর্মে কয়েকটি আয়াতকে সামনে রেখে নিজের জীবনকে পরখ করে দেখুন, আপনি কোন পথের পথিক।

সফল মু'মিন

আল্লাহ তা'আলা সফল মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)

অর্থাৎ নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মু'মিনগণ। যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত আদায়কারী। (সূরা মু'মিনুন ১-৪)

দেখুন! এখানে সফল ব্যক্তিদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যার প্রথমেই রয়েছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন নামাযের কথা। তৃতীয় নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে আরেকটি রুকন যাকাতের কথা। এতদুভয়ের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে لـغو অর্থাৎ অহেতুক কাজকর্ম, কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার কথা। এবার আপনারাই অনুমান করে নিন। অহেতুক বিষয় পরিত্যাগ করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাচ্চা মু'মিন হওয়ার জন্য যেমন নামায ও যাকাত আদায় করা জরুরি। ঠিক তেমনই অহেতুক বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যকীয়।

অহেতুক কাজের সংজ্ঞা

অহেতুক কাজকর্ম কাকে বলে? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের কর্ম সম্পাদন করার নাম কি لـغو অহেতুক? পর নিন্দা করা কি অহেতুক? অন্যকে গালি দেয়া কি অহেতুক কাজের শামিল? কখনো নয়! এগুলো সব কবীরা গুনাহ, হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। আরে ভাই! অহেতুক বিষয় তো হলো, যাতে না দুনিয়ার ফায়দা আছে, না আখেরাতের। যা করলে না কোনো সওয়াব পাওয়া যায়, আর না কোনো মন্দের প্রতিকার হয়।

ইবাদুর রহমানের পরিচয়

আল্লাহর তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

অর্থাৎ রহমানের বান্দা তারা, যারা অন্যায় কাজে শামিল হয় না। আর যখন কোনো অহেতুক বেহুদা কার্যকলাপের নিকট দিয়ে যায়, তখন আত্মসম্মান বাঁচিয়ে চলে যায়। (সূরা ফুরকান-৭২)

দেখুন, এখানে ইবাদুর রহমানের পরিচয় বলা হয়েছে যে, তারা অহেতুক কাজে শরীক হয় না। বরং তারা অহেতুক কাজকে অহেতুক জেনে, বাজেকে বাজে জেনে, মন্দকে মন্দ জেনে নিজের মানসম্মান রক্ষা করে এ ধরনের মজলিস থেকে সরে পড়ে।

অনর্থক কথাবার্তার মজলিস এড়িয়ে চলা

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

অর্থাৎ তারা যখন কোনো বেহুদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম। আমরা জাহেলদের সঙ্গে জড়িত হই না। (সূরা কাসাস-৫৫)

আপনার উপস্থিতিতে কোনো মজলিসে অহেতুক আলোচনা শুরু হলে হিম্মত করে তাদেরকে সালাম দিয়ে সরে যান। ইনশাআল্লাহ সফল হবেন।

সব কিছুই রেকর্ড হচ্ছে

গল্পগুজব, অহেতুক কথাবার্তা, কাজকর্ম যাই করেন, সব কিছুই কিন্তু রেকর্ড করা হচ্ছে, সময়মতো সবই দেখতে পাবেন। জবাবদিহিও করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থাৎ মানুষ যাই বলে একজন ফেরেস্তা তা রেকর্ড করে নেন। (সূরা ক্বাফ ১৮)

এরপর আর সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভালো-মন্দ সব ধরনের বিষয়ই রেকর্ড করে রাখেন। অথচ আমরা এ ব্যাপারে বে-খবর।

এ ব্যাপারে জবাবদিহি করার ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থাৎ যে ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান নেই। এমন বিষয়ের পেছনে লেগে থেকো না। কারণ কান, চোখ এবং

অন্তরকেও এ ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। (সূরা বনী ইসরাইল ৩৬)

ভেবে দেখুন, এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, অহেতুক কোনো কিছু দেখলে-শুনলেও হিসাব দিতে হবে। তাহলে মোবাইল নিয়ে যে আপনারা ব্যস্ত থাকেন এটা কি হিসাব ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে? এ তো গেল কুরআনের ভাষায় অনর্থক কাজের পরিণতির কথা। এবার আসুন জেনে নিই হাদীস এ ব্যাপারে কী বলে?

ভালোমানের মুসলমান

এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

من حسن اسلام المرأ تركه ما لا يعنيه۔

অর্থাৎ ভালো মুসলমান হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

বোঝা গেল, ভালো মুসলমান হতে হলে বাজে কাজকর্ম ও কথাবার্তা ছেড়ে দিতে হবে।

আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় জিনিস

হযরত মুগীরা বিন শুবা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، واضاعة المال وكثرة السوال۔

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন ১. অতিকথন। ২. আজেবাজে কাজে সম্পদ নষ্ট করা। ৩. এবং অনর্থক বেশি প্রশ্ন করা। (বুখারী)

বলুন তো, ইন্টারনেটের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করেন, তা কোন খাতে পড়ে?

নাজাতের পথ

হযরত উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো–

ماالنجاة؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك۔

নাজাত কিসের মধ্যে নিহিত? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তিনটি কাজ করো তাহলে তোমার জন্য নাজাত অবধারিত। ১. তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণ করো। ২. মানুষের সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকো। ৩. আর অতীত কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করো। (তিরমিযী)

বোঝা গেল, নাজাত পেতে হলে অনর্থক বিষয় ত্যাগ করার বিকল্প নেই। কারণ অতিকথন-অতিবচন পতনকে ত্বরান্বিত করে।

যবান ঠিক ঈমান ঠিক

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔

কোনো বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কলব শোধরাবে না। আর তার যবান ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কলব শোধরাবে না। (মুসনাদে আহমদ)

জান্নাতের প্রতিবন্ধক

হযরত কা'ব বিন আজরাহ (রা.) বলেন, আমাকে আমার মা বললেন, هيئأك لك الجنة. কা'ব তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ কথা শুনে বললেন, من هذه المتألية على الله আল্লাহর ওপর কর্তৃত্ব-জোর খাটাচ্ছে কে? কা'ব (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমার মা। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مايدريك يا ام كعب؟ لعل كعبا قال مالا ينفعه ومنع مالا يغنيه۔

হে কা'বের মা! তোমার জানা নেই হয়তো কা'ব এমন কথা বলেছে, যা তার জন্য লাভজনক নয়। অথবা এমন কোনো জিনিস দিতে সে বিরত রয়েছে, যার তার প্রয়োজন নেই। (তাবারানী)

আপনারা উলামায়ে কেরাম একটু চিন্তা করুন। হযরত কা'ব (রা.)-এর মতো সাহাবীর ব্যাপারে যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, হয়তো সে কোনো অনর্থক কথা বলেছে বা অহেতুক কাজ করেছে যে কারণে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। বলুন তো! আমাদের কী অবস্থা হবে? মোবাইল আমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিবন্ধক হচ্ছে না তো?

আজাবের লক্ষণ

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন–

من علامة اعراض الله عن العبد ان يجعل شغله فى مالا يعنيه خذلانامن الله

অর্থাৎ আল্লাহ কোনো বান্দার ওপর অসন্তুষ্ট এটা বোঝার উপায় হলো, আল্লাহ তাকে অনর্থক কাজে লাগিয়ে দেবেন, তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে।

বোঝা গেল, অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকা, লিপ্ত হওয়া গুনাহের শাস্তির পূর্ব লক্ষণ। অতএব যারা অহেতুক কাজকর্ম, গল্পগুজব ও কথাবার্তায় ব্যস্ত সময় কাটান, বিশেষ করে মোবাইলকে বৈধ কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করেন তাঁরা এর থেকে তাওবা করুন এবং এগুলো পরিহার করুন। তবেই আল্লাহ আমাদের ওপর রাজি-খুশি হবেন। চারদিকে চোখ খুলে তাকালেই দেখা যায়। পৃথিবীতে আজ অনর্থক ও গুনাহের কাজের উপকরণের সয়লাব। এবং আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের সিংহভাগই এসব উপকরণের ব্যবহারের প্রতি আসক্ত ও পারদর্শী। এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ এই শ্রেণীর প্রতি নারাজ। অতএব আসুন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের প্রস্তুতিতে লেগে যাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন...

সংকল ও গ্রন্থনা : মুফতী নুর মুহাম্মদ

আযানের সঠিক পদ্ধতি ও জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ মসজিদে লক্ষ করা যায় যে, আযানের মধ্যে মাদ্দের (টানের) ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়। তাজবীদের কায়েদা অনুসরণ না করেই যেখানে এক আলিফ থেকে বেশি টানা নিষেধ সেখানে তিন চার আলিফ পর্যন্ত টানা হয়। আর যেখানে শেষে তিন আলিফ মাদ্দ আছে, সেখানে মুআয্যিনের দম শেষ না হওয়া পর্যন্ত টানতে থাকে। অথচ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে এই তরীকার আযানকে নিকৃষ্ট বিদআত ও মাকরূহে তাহরীমী পর্যন্ত বলা হয়েছে এবং এই ধরনের আযানদাতাকে জাহিল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো :

وحده مقدار الف وصلا و وقفا ونقصه عن الف حرام شرعا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه فما يفعله بعض ائمة المساجد واكثر المؤذنين من الزيادة فى المد الطبعى عن حده العرفى اى عرف القراء فمن اقبح البدعة واشد الكراهة لاسيما وقد يقتجى بهم بعض الجهلة من القراء (نهاية القول المفيد فى علم التجويد للشيخ محمد مكى نصر ص١٦٦ كلمات اذان مين مد كى تحقيق لابى الحسن الاعظمى , مجالس ابرار ص١٣٥)

আনুবাদ : মাদ্দে ত্বাঈর পরিমাণ হলো এক আলিফ। চাই তাতে ওয়াক্ফ করা হোক বা মিলিয়ে পড়া হোক। মাদ্দে ত্বাঈতে এক আলিফ থেকে কম টানা হারাম। কেউ এমনটা করলে তাকে পাকড়াও করা হবে। আর এক আলিফ থেকে কম টানা ছেড়ে দেওয়ার কারণে সাওয়াব লেখা হবে। কাজেই কিছু কিছু মসজিদের ইমামগণ এবং অধিকাংশ মুআয্যিনগণ মাদ্দে ত্বাঈকে কিরাআতের পরিভাষায় তার প্রচলিত সীমা থেকে বেশি টেনে থাকেন এটা নিকৃষ্টতম বিদআত এবং শক্ত পর্যায়ের মাকরূহ। বিশেষত যখন তাদেরকে কিছু মূর্খ কারীগণ অনুসরণ করে থাকেন। নেহায়াতুল কাওলুল মুফীদ ফী ইলমিত তাজবীদ পৃ. ১৬৬ (কালিমায়ে আযান মে মাদ্দ কি তাহকীক, মাজালিসে আবরার পৃ. ১৩৫)

فانه لايجوز قصر احدهما عند جميع القراء ولو قرأ بالقصر يكون لحنا جليا وخطأ فاحشا مخالفا لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالطرق المتواترة , وكذا اذا زاد فى المد الاصلى والطبعى على مد العرفى من قدر الف بان جعله قدر الفين او اكثر فانه محرم قبيح لاسيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة و يستحسن ماصدر عنهم من القراء ة . (المنح الفكرية شرح مقدمة الجزرية ص٥٦)

অনুবাদ: মাদ্দে ওয়াজিব এবং মাদ্দে লাযেমে সকল কারীদের নিকট মাদ্দ ছেড়ে দেওয়া বা কম করা নাজায়েয। যদি তা মাদ্দ ছাড়া পড়া হয় তাহলে লাহনে জলী এবং মারাত্মক ভুল হবে এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) থেকে মুতাওয়াতিরভাবে যা প্রমাণিত তার বিপরীত হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যখন মাদ্দে আসলী ও মাদ্দে ত্বাঈকে এক আলিফ থেকে বেশি টানা হবে। অর্থাৎ দুই আলিফ বা তার চেয়ে বেশি টানা হয়। এটা নিকৃষ্ট হারাম... (আল মিনাহুল ফিকরিয়্যাহ শরহু মুকদ্দামাতিল জাযরিয়্যাহ পৃ. ৫৬)

ويترسل فيه اى يتمهل بلا لحن وترجيع ...فلا ينقص شيئا من حروفه ولايزيد من كيفيات الحروف كالحركات و السكنات و المدات و غير ذالك لتحسين الصوت .شرح الوقاية ١/١٣٤)

অনুবাদ : আর আযান দেবে ধীরে ধীরে কোনো লাহন (মাদ্দের অতিরিক্ত টানা) ও তারজী (প্রথমে আস্তে পরে বড় আওয়াজে বলা) ছাড়া। সুতরাং আযানের মধ্যে কোনো হরফ কমাবে না এবং তার মধ্যে কোনো হরফ বাড়াবে না। অনুরূপভাবে আওয়াজকে সুন্দর করার জন্য হরফের অবস্থার মধ্যে বাড়াবে-কমাবে না যেমন : হরকত, সাকিন, মাদ্দ ইত্যাদি। (শরহে বেকায়া ১/১৩৪)

উল্লেখ্য এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আযানের মধ্যে মদ্দ বাড়াবে না কমাবে না। সুতরাং আল্লাহু আকবার এর লামের মধ্যে এক আলিফ মাদ্দকে অধিকাংশ মুআয্যিনগণ যে ৩-৪ আলিফ টানতে থাকেন তা নিঃসন্দেহে ভুল এবং সুন্নাতের খেলাফ।

والترجيع بالقران و الاذان بالصوت الطيب طيب ان لم تزد فيه الحروف وان زاد كره له .الدر المختار٩/٦٠٤)

অনুবাদ : সুমিষ্ট আওয়াজে টেনে টেনে কুরআন পড়া এবং আযান দেওয়া উত্তম যতক্ষণ না তার ভেতর হরফ বাড়ানো হয়। আর যদি হরফ বাড়ানো হয় তবে তা মাকরূহ। আদ্দুররুল মুখতার ৯/৬০৪

আর এ কথা স্পষ্ট যে, মাদ্দকে তার গণ্ডি থেকে বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই সেখানে কোনো না কোনো হরফ বৃদ্ধি পাবে, যা

জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম।

و فى الذخيرة وان كانت الالحان لاتغير الكلمة عن وضعها و لاتؤدى الى تطو يل الحروف التى حصل التغنى بها حتى يصير الحرف حرفين بل لتحسين الصوت و تزيين القراءة لايوجب فساد الصلاة و ذالك مستحب عند نا فى الصلاة وخارجها .رد المحتار٩/٦٠٤)

অনুবাদ : যদি সুর শব্দের গঠনে পরিবর্তন না আনে এবং হরফকে লম্বা না করে যেমন : এক হরফকে দুই হরফ বানিয়ে দেওয়া; বরং সুর আওয়াজ ও কিরাআতের সৌন্দর্যকরণের জন্য হয় তাহলে তা নামাযকে ফাসেদ করবে না। এটা আমাদের নিকট নামাযে এবং নামাযের বাহিরে মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ৯/৬০৪)

ويكره التلحين و هو التغنى بحيث يؤدى الى تغير كلماته كذا فى شرح المجمع لابن الملك و تحسين الصوت للاذان حسن ما لم يكن لحنا كذا فى السراجية .الفتاوى الهندية ١/٥٦)

অনুবাদ : তালহীন করা মাকরূহ। আর তালহীন হলো এমনভাবে সুর দেওয়া যে, তা শব্দের গঠনে পরিবর্তন আনে। আযানের জন্য আওয়াজকে সুন্দর করা পছন্দনীয়, যতক্ষণ না তা শব্দের ভেতর পরিবর্তন নিয়ে আসে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১/৫৬)

উল্লেখ্য, মাদ্দের মধ্যে কমবেশি করলে শব্দের গঠনের ভেতর পরিবর্তন আসে। সুতরাং প্রত্যেক মাদ্দকে তার নিয়ম অনুযায়ী টানা জরুরি। সুর করার জন্য বেশি টানা যাবে না।

قال الشيخ اللكنوى فى السعاية على قول شرح الوقاية :قوله فلا ينقص شيئا من حروفه الخ هذا بظاهره يفيد انه يكره التلحين فى جميع كلمات الاذان و عليه الجمهور(السعاية١/١٥)

অনুবাদ : শারেহে বেকায়ার উক্তি 'সুতরাং আযানের হরফসমূহের মধ্যে কোনো হরফকে (যেখানে মাদ্দ আছে সেখানে মাদ্দ না করার দ্বারা) কমাবে না...' উল্লিখিত উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, আযানের যেকোনো বাক্যে কোনো হরফকে পরিবর্তন করা মাকরূহ। আর এটাই জমহূরের মত। (আসসিআয়াহ ১/১৫)

التغنى و الترنم فى الاذان بالطريقة المعروفة عند الناس فى زما ننا هذا لايقرها الشرع لانه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى ...الحنفية قالوا : التغنى بالاذان حسن الا اذا ادى الى تغيير الكلمات بزيادة حركة او حرف فانه يحرم فعله ولايحل سماعه .كتاب الفقه على المذاهب الاربعة١/٣٩١)

বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে যেভাবে আযান দেওয়া হয়, শরীয়ত তা সমর্থন করে না। কারণ আযান এমন একটি ইবাদত, যার মধ্যে খুশু-খুযু কাম্য। হানাফীদের নিকট সুন্দর আওয়াজে আযান দেওয়া উত্তম। তবে এটা যেন শব্দের মধ্যে পরিবর্তন না আনে যেমন, হরকত বা হরফ বাড়িয়ে দেওয়া। কারণ এমনটি করা হারাম এবং এমন আযান শোনা তথা সমর্থন করা জায়েয নয়।

৯. বুখারী শরীফের কিতাবুল আযানে আছে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.), যিনি এই উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন তিনি তাঁর মুআয্যিনকে বললেন, اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا 'সাদাসিধে আযান দাও অন্যথায় আযান দেওয়া বন্ধ করো'। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, বাবু রফউস সাওতি বিন্‌নিদা)

বর্তমান যামানায় মাদ্দের মধ্যে বৃদ্ধি করে যেভাবে রং-ঢংয়ের আযান দেওয়া হচ্ছে আবার অনেকে গানের সুরে আযান দিচ্ছেন তা কোনো অবস্থায় বুখারী শরীফের এই হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে না। বরং তা মুআয্যিনদের খামখেয়ালি ও মনগড়া খেলাফে সুন্নাত আযান। নবীজি (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম)-এর সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অনুধাবন করা উচিত এবং সর্বত্র সাদাসিধে সুন্নাত তরীকার আযান চালু করা উচিত।

অনেকে কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ (রহ.)-এর কিতাব 'মেফতাহুল কামাল শরহু তুহফাতিল আতফাল'-এর বরাত দিয়ে মুফীদুল আকওয়াল এবং ফাতহুল মালিকিল মুতাআ'ল নামক কিতাবদ্বয়ের নিম্নোক্ত এবারত পেশ করে থাকেন

وله سبب معنوى كالتعظيم ولاجله اجاز الفقهاء مد الف الجلالة اربع عشرة حركة فى الله اكبر.

'মাদ্দের অভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে যেমন মাদ্দে তা'যীম। আর এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম আল্লাহু আকবারে আল্লাহু শব্দে সাত আলিফ পর্যন্ত টানার অনুমতি দিয়েছেন।' অথচ ফিকহের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে কোনো ফকীহ আল্লাহু আকবার-এর আল্লাহু শব্দে সাত আলিফ পর্যন্ত টানার অনুমতি দিয়েছেন, এমনটি পাওয়া যায় না।

আর আল্লাহু শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় সাবাবে মা'নাবী (অভ্যন্তরীণ কারণ)-এর কথা বলে এক আলিফ থেকে বেশি টানা একাধিক কারণে সঠিক নয়–

এটা একটা দুর্বল কারণ অর্থাৎ সাবাবটি সাবাবে যয়ীফ।

আহলে আরব সাবাবে মা'নবী-এর কারণে যে মাদ্দে তা'যীম-এর কথা বলে থাকে তা লায়ে নাফী জিন্‌স-এ ব্যবহৃত হয়। যাতে নাফী এর মধ্যে মুবালাগা হয়। যেমন : لااله الاانت। মুহাক্কিক ইবনুল জাযরী (রহ.) মাদ্দে তা'যীমীকে আল্লাহু শব্দে বলেননি।

তিনি বলন,

واما السبب المعنوى فهو قصد المبالغة فى النفى وهو سبب قوى مقصود عند العرب وان كان اضعف من السبب اللفظى عند القراء ومنه مد التعظيم نحو لااله الاالله,لااله الاهو

'আর মাদ্দের অভ্যন্তরীণ কারণ, তা হলো না সূচককরণকে অতি রঞ্জন করা। এটা আরবদের নিকট একটা শক্তিশালী কারণ। যদিও তা কারীদের নিকট শাব্দিক কারণ থেকে দুর্বল। আর এর

মধ্য থেকে হচ্ছে মাদ্দে তা'যীম যেমন–
لااله الاالله,لااله الاهو
এ ধরনের কিছু ইবারত দেখে মানুষ আযানের মধ্যেও মাদ্দে তা'যীম-এর কথা বলে আল্লাহু শব্দে মিলিয়ে পড়ার সময়ও টান শুরু করে দেয়। অথচ এই মাদ্দ লায়ে নাফী জিন্‌স-এর জন্য প্রযোজ্য।

এটা ইমাম শাতেবী (রহ.) এবং জমহুর কারীদের নিকট আমলযোগ্য নয়।

অধিকাংশ উলামাদের মতে, আল্লাহু শব্দে মিলিয়ে পড়ার সময় এক আলিফ থেকে বেশি টানা শুধু নাজায়েয নয় বরং নিকৃষ্ট বিদআত বলা হয়েছে। আর কেউ কেউ জায়েয বলেছেন। আর মূলনীতি হলো, যখন কোনো বিষয়ে জায়েয ও নাজায়েযের মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন নাজায়েযকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনেকে তাআমুলের কথা বলে এটা জায়েয বলতে চায়। অথচ যেকোনো তাআমুল দলিল নয়। তাআমুল দলিল হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা নস (দলিল)-এর খেলাফ না হওয়া। আর উপরে আযান সম্পর্কে স্পষ্ট দলিল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই দলিলের বিরুদ্ধে তাআমুল গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা হলো, আযানে আল্লাহু আকবারের আল্লাহু শব্দের লামের মধ্যে মাদ্দে তবাঈ অর্থাৎ এক আলিফ টান হবে। এখানে এক আলিফ থেকে বেশি টানা যাবে না। হ্যাঁ, আল্লাহু শব্দ যখন বাক্যের শেষে আসে অনুরূপভাবে الصلاة ,الفلاح তে মাদ্দে আরেযীর কারণে আমাদের কিরাআতে তিন আলিফ এবং অন্য মাযহাব মতে পাঁচ আলিফ পর্যন্ত টানা জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক জিনিস জানার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান

নফল নামাযের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ। এ জন্য শরীয়তে নফল নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। চাই তা রমাযান মাসে হোক বা রমাযানের বাইরে হোক। ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইযামের মাসলাক এ ব্যাপারে এমনই। সালাফে সালেহীনের ফাতাওয়া এবং তাদের আমলও এমন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে তারাবীহের নামায এর ব্যতিক্রম। তারাবীহের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) থেকে প্রমাণিত। এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং চৌদ্দশত বছরের ধারাবাহিক আমল ও খিলাফে কিয়াস সাবেত। আর খেলাফে কিয়াস অর্থাৎ সাধারণ নিয়মবহির্ভূত যে বিধান সাবেত হয় তা তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য বিধানকে তার ওপর কিয়াস করা যায় না। তাই এমন বলা চলবে না যে, যেহেতু তারাবীহের নামায জামা'আতের সাথে পড়ার বিধান, সুতরাং কেউ যদি তারাবীহ এর জামা'আত শেষ হওয়ার পর পুনরায় নিজেরা তারাবীহ পড়তে চায় বা তাহাজ্জুদ নামায জামা'আতে পড়তে চায় তাহলে জামা'আতের সাথে পড়তে পারবে।

কেননা তাহাজ্জুদ তো সব সময়ের জন্যই নফল, আর দ্বিতীয়বারের তারাবীহও সাধারণ নফলে পরিণত হয়েছে, আর সাধারণ নফল নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। যেমন বাদায়িউস সানায়ি ওয়ালা বলেন–

اذاصلوا التراويح ثم ارادوا ان يصلوابها ثانيا يصلى فرادى لابجماعة لان الثانية تطوع مطلق و التطوع المطلق بجماعة مكروه (بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠)

অর্থাৎ যদি লোকেরা তারাবীহর নামায পড়ার পর দ্বিতীয়বার পড়ার ইচ্ছা করে তাহলে একাকী পড়বে, জামা'আতে পড়বে না। কেননা দ্বিতীয়বারের তারাবীহ সাধারণ নফলের ন্যায়, আর সাধারণ নফল জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড পৃ. ১২৩, বাযযাযিয়া ৪র্থ খণ্ড, ৩১ পৃ.)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, জামা'আতের সাথে নফল পড়া মুস্তাহাব নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম রামাযানের তারাবীহ ছাড়া এমন করেননি। (শামী ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৪)

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, কাফী কিতাবের সূর্যগ্রহণের নামায অধ্যায়ে হাকেম শহীদ (রহ.)ও স্পষ্ট করেছেন, যে তারাবীহ ও সূর্যগ্রহণের নামায ছাড়া অন্যান্য নফল নামায জামা'আতের সথে পড়া মাকরূহ। (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮)

এ ছাড়া বিবেকের দাবি এটাই যে, নফল নামায একাকী পড়া হবে। কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে গোপনীয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উদ্দেশ্যেই বলেছেন–

صلوة المرء فى بيته افضل من صلوته فى مسجدى هذا الا المكتوبة

অর্থ : কোনো ব্যক্তির নফল নামায তার ঘরে পড়া আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) পড়ার চেয়ে উত্তম, তবে ফরয নামাযের কথা ভিন্ন অর্থাৎ ফরয মসজিদে পড়া জরুরি। (আবূদাউদ শরীফ, হা. নং ১০৪৪) অন্য হাদীসে আছে–

أفضل صلاة الرجل صلاته فى بيته الا المكتوبة -

অর্থাৎ ফরয নামায ব্যতীত পুরুষের শ্রেষ্ঠ নামায হলো তার ঘরের নফল নামায। (তবরানী ৫/১৬০)

শুধু ফরয নামাযকে অন্য সকল নামায থেকে পৃথক করার দাবি হলো তারাবীহের নামাযও অন্যান্য নফলের ন্যায় বাড়িতে একাকী পড়া উত্তম। তবে তারাবীহের নামায সাধারণ নফলের হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা তারাবীহের জামা'আত নবী আলাইহিসসালাম ও সাহাবায়ে কেরাম

থেকে প্রমাণিত।

উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নফল নামায একা পড়তে হয়, জামা'আতবদ্ধ হয়ে নয়। যদি জামা'আত করার অনুমতি থাকত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম নফল নামাযের জামা'আত করা থেকে বিরত থাকতেন না।

এর পরও কোনো কোনো আলেম শুধুমাত্র রমাযান মাসের তাহাজ্জুদের জামা'আতকে বৈধ বলতে চান। তাঁরা দলিল হিসেবে হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবের ওই সমস্ত বর্ণনা পেশ করেন, যার মধ্যে তারাবীহকে বোঝানোর জন্য কিয়ামে রমাযান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বলেন, কিয়ামে রামাযান যে নামাযের মাধ্যমেই হাসিল হবে এখানে সেই নামাযই উদ্দেশ্য। আর তাহাজ্জুদ দ্বারাও কিয়ামে রামাযান হাসিল হয়। আর কিয়ামে রামাযানে জামা'আত জায়েয হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু সকল উলামায়ে কেরাম একমত, তাই রামাযান মাসে তাহাজ্জুদের মধ্যেও জামাআত জায়েয।

কিন্তু বাস্তবতা হলো কিয়ামে রামাযান আরেক অর্থে যদিও ব্যাপক তবে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষা হলো তারা কিয়ামে রামাযানকে শুধু তারাবীহর সাথে নির্দিষ্ট করে থাকেন। তবে তারাবীহ না লিখে কিয়ামে রামাযান কেন লেখেন সে ব্যাপারে আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবারতী (রহ.) বলেন,

তারাবীহের নামাযের বয়ানের জন্য কিয়ামে রামাযান দ্বারা শিরোনাম করা হয় হাদীসের শাস্ত্রের অনুকরণের উদ্দেশ্যে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর রোযা ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য কিয়ামে রামাযানকে সুন্নাত করেছি। (ইনায়া আলা হামিশিল ফাতহিল কদীর ১/৩৩৩)

এ ছাড়া ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দেখলে বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামে রামাযান দ্বারা তারাবীহই উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাহাজ্জুদ নয়। যেমন হিদায়ার গ্রন্থাকার فصل فى التراويح এর স্থলে فصل فى قيام رمضان এর শিরোনাম লাগিয়ে তারাবীহর নামাযের আলোচনা শুরু করেছেন। হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতেও এমনটি করা হয়েছে। যেমন ফাতহুল কদীরে মুহাক্কীক ইবনুল হুমাম (রহ.) কিয়ামে রমাযান শিরোনামে তাহাজ্জুদের পরিবর্তে তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। যেমন فصل فى قيام رمضان .التراويح جمع ترويحة (ফাতহুল কদীর ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩)

'ইনায়া' গ্রন্থে আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবারতী (রহ.) কিয়ামে রামাযান শিরোনাম দিয়ে তারাবীহকে সুনান এবং নাওয়াফেল থেকে আলাদা করার কারণ বর্ণনা করা শুরু করেছেন।

শামসুল আইম্মা সারাখসী (রহ.)

তারাবীহর নিয়তের ব্যাপারে বলেন, সঠিক কথা হলো তারাবীহর নিয়ত করবে অথবা কিয়ামুললাইলের নিয়ত করবে। (মাবসূত লিস্সারাখসী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫)

ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে আছে, 'যদি তারাবীহ অথবা সুন্নাতে ওয়াক্ত বা রামাযানের কিয়ামুললাইলের নিয়ত করে তাহলেও জায়েয আছে। (১ম খণ্ড, পৃ ২১৬)

এসব ইবারত দ্বারা বোঝা যায় যে, কিয়ামুললাইল ও তারাবীহ এক ও অভিন্ন বিষয়, যার কারণে তারাবীহের ক্ষেত্রে কিয়ামুললাইল বলে নিয়ত করলে ও তারাবীহ হয়ে যাবে। এমনিভাবে আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্মিরী (রহ.) তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ العرف الشذى এর মধ্যে قيام شهر رمضان এর তাফসীর করেছেন তারাবীহ দ্বারা। (১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯)

আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

باب فى قيام شهر رمضان هذا القيام كان عاما ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح . (الكوكب الدرى ١:٢٦٧)

অর্থাৎ কিয়ামে রামাযান বিষয়টি আগে ব্যাপক ছিল পরে তারাবীহর সাথে খাছ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন সাধারণভাবে 'কিয়ামে রামাযান' বললে তারাবীহই উদ্দেশ্য হবে। (আল কাউকাবুদ্দুররী ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭)

এ ছাড়া তাহাজ্জুদের জামা'আতকারীরা মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর এই ইবারত দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন–

ولهذا :قال محمد رحمة الله عليه كله نأخذ لا باس بالصلوة فى شهر رمضان ان يصلى الناس تطوعا بامام لان المسلمون قد اجمعوا على ذلك

অর্থাৎ 'রামাযান মাসে ইমামের পেছনে নফল পড়তে কোনো অসুবিধা নেই কেননা এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে, এর জবাবে আমরা বলব, তারা যে ইবারতকে নফলের জামা'আত জায়েয হওয়ার দলিল মনে করেছেন এটা আসলে তাদের বিপক্ষের, অর্থাৎ জায়েয না হওয়ার দলিল আর সে দলিল মুসলমানদের ইজমা। কারণ তারাবীহ ছাড়া অন্য কোনো নফল নামাযের জামা'আতের ওপর ইজমা তো দূরের কথা মূল জামা'আতই খাইরুল কুরূনে সাবেত নেই।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, নফলের জামা'আত কোনোক্রমেই বৈধ নয়। চাই রামাযান মাসে হোক বা রামাযানের বাইরে হোক। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, কোথাও এ ধরনের জামা'আত হতে দেখলে তাদেরকে হেকমতের সাথে বুঝিয়ে এই মাকরূহে তাহরীমী কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

জামা'আতবদ্ধ নামাযে কাতার সোজা করা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

রাসূলুল্লাহ (সা.) জামা'আতে নামায আদায়কালে কাতার সোজা করা এবং কাতারের শূন্যস্থান পূর্ণ করে কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। একইভাবে প্রথম কাতারে অংশ নেয়ার প্রতিও জোরালোভাবে উৎসাহ দিতেন। সাহাবী আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত–

كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول "استووا ولا تختلفوا، فتختلفوا قلوبكم، ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم قال ابو مسعود "فأنتم اليوم أشد اختلافا۔

রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে আমাদের কাঁধ ধরে বলতেন, সোজা হও। আঁকা বাঁকা হয়ো না। তাহলে তোমাদের হৃদয় আঁকা বাঁকা হবে। তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ব ও বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। পরবর্তীরা তাদের কাছে। এভাবে পরবর্তীরা ওদের কাছে দাঁড়াবে। বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা আজ এর খুব ব্যতিক্রম করে চলেছো। (সহীহ মুসলিম ১/১৮১ হা. ৪৩২)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

لويعلم الناس مافى النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لا ستهموا

আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে নামায আদায়ে কী বিনিময় রয়েছে, তা যদি মানুষ জানত আর লটারি ব্যতীত তা লাভ করা সম্ভব না হতো তাহলে তারা লটারির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করত। (সহীহ মুসলিম ১/১৮২, হা: ৪৩৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১/৩৩২, হা: ৩৮১২)

সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

أتموا الصف المقدم ثم الذين يليه فما كان من نقص فليكن فى الصف المؤخر

প্রথম কাতার পূর্ণ করো। অতঃপর পরের কাতার। আর অসম্পূর্ণ কাতার সর্বশেষে থাকবে। (আবু দাউদ ১/৯৮, হা. ৬৭১)

সাহাবী ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

أقيموا الصفوف، فانما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا فى أيدى إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشياطين ومن صلى صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله تبارك وتعالى۔

তোমরা কাতার সোজা করো। কেননা এতে তোমাদের কাতার ফেরেশতাদের কাতারের মতো হবে। তোমরা পরস্পর কাঁধ বরাবর রেখো, শূন্যস্থান পূর্ণ করো। অপর ভাইয়ের বাহুতে বাহু মিলিয়ে দাঁড়াও। শয়তানের জন্য ফাঁকা স্থান রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে নেবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করবেন। (আবু দাউদ ১/৯৭ হা. ৬৬, মুসনাদে আহমদ ২/৯৮ হা. ৫৭২৪)

জামা'আতে নামায আদায়কালে কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, এ সম্পর্কীয় আরো অনেক অনেক হাদীস রয়েছে। এসব হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মাসাঈল আলোচনার দাবি রাখে। নিম্নে কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

ক. কাতার সোজা করার গুরুত্ব

উপরের হাদীসে উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের কাঁধ ধরে কাতার সোজা করতেন। সোজা করার নির্দেশ দিতেন। সাহাবাগণও এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বারোপ করতেন। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) কাতার সোজা করতে যেয়ে আবু উসমান নাহদীর পায়ে আঘাত করেছেন। (ফাতহুল বারী ২/২৪৬)

সাহাবী হযরত বিলাল (রা.) নামাযের পূর্বে মুসল্লীদের কাঁধ ধরে ধরে কাতার সোজা করতেন। কেউ বাঁকাভাবে দাঁড়ালে তার পায়ে আঘাত করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক ২/৪৭ হা. ২৪৩৫)

এসব বর্ণনার প্রতি লক্ষ করে কোনো কোনো ইমাম কাতার সোজা করা ওয়াজিব বিষয় বলে গণ্য করেছেন। তবে এ সম্পর্কীয় যাবতীয় বর্ণনা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ হয় যে, কাতার সোজা করা ওয়াজিব বা ফরয নয়। তবে তা অবশ্যই সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর কাতার সোজা না করা হলে নামায হবে মাকরূহ। এ বিষয়ে আরো দু'টি বর্ণনা সংযোজন করা হলে মূল বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

১. সাহাবী আবু হুরায়রা (রা.) থেকে

বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,
أقيموا الصف فى الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة
"তোমরা কাতার সোজা করো, কেননা কাতার সোজা করা নামাযের শোভা (সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়) (সহীহ বুখারী ১/১০০, হা. ৭২২)

২. সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–
سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف من اقامة الصلاة
কাতার সোজা করো। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশবিশেষ। (সহীহ বুখারী ১/১০০ হা. ৭২৩)

উল্লেখ্য, প্রথম বর্ণনায় কাতার সোজা করাকে নামাযের শোভা ও সৌন্দর্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। যা ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয় না। একইভাবে অপর বর্ণনায় কাতার সোজা করাকে নামায পরিপূর্ণতার অংশ বলা হয়েছে। বস্তুত কোনো তৈরি জিনিসকেই রূপ দেয়া বা পরিপূর্ণতা প্রদান করা হয়। তাই এই দু'টি বর্ণনার আলোকে বোঝা যায় কাতার সোজা না হলেও নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে কাতার সোজা করার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবাগণের গুরুত্বারোপ ও নির্দেশসূচক বর্ণনার সঙ্গে উল্লিখিত দুটি বর্ণনা মেলানো হলে কাতার সোজা করা ওয়াজিব না হলেও ন্যূনতম সুন্নাতে মু'আক্কাদা না বলার কোনো উপায় নেই। (উমদাতুল কারী ৪/৩৫৯)

খ. কাতারে ফাঁকা পূরণ করার গুরুত্ব

জামা'আতবদ্ধভাবে নামায আদায়কালে একে অপরের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ানো সমীচীন। দুজনের মধ্যে অথবা সামনের কাতারে ফাঁকা রাখা মোটেই ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق
"তোমাদের কাতারগুলো খুব মিলিয়ে, কাছাকাছি করো এবং পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রেখো।" (সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৫৩৯, হা. ২১৬৬)

উল্লেখ্য যে এ পরিসরে বর্তমান মুসলিম সমাজে আরো স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতার প্রয়োজন। বর্তমানে অনেকেই মসজিদে পৌঁছেই বিলম্বে। আর যারা জামা'আত শুরুর আগে মসজিদে পৌঁছে তারাও এদিক-সেদিক বসে থাকে। ইকামতের পরেও কেউ কেউ বসে গল্প করে থাকে অথবা নিজে পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে অন্যদেরকে সামনে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম কাতারে অংশ নেয়া ও কাতার পূর্ণ করার প্রতি কতই না গুরুত্বারোপ করেছেন।

গ. কাতার সোজা ও ফাঁকা পূরণ করার ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব

সাহাবী আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুক্তাদীদের দিকে লক্ষ করে বলতেন–
اقيموا صفوفكم وتراصوا
"তোমরা কাতার সোজা করো, মিলে-মিলে দাঁড়াও।" (সহীহ বুখারী ১/১০০, হা. ৭১৯) কখনো তিনি ডানে-বামে তাকাতেন, সবাইকে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে বলতেন। (আবু দাউদ ১/৯৮, হা. ৬৭০)

সহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন তাকবীর বলার পূর্বে জনৈক ব্যক্তির বুক কাতারের সামনে দেখতে পেয়ে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! কাতার ঠিক করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখ ফিরিয়ে দেবেন। (সহীহ মুসলিম ১/১৮২, হা. ৪৩৬)

এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলোর আলোকে বোঝা যায় যে, নামাযে কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে ইমামের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যেক মসজিদেই কাতার সোজা করার মতো গতানুগতিক ব্যবস্থা থাকে। এমতাবস্থায় ইমামের দায়িত্ব অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে এ বিষয়ে ইমাম সচেতন থাকবেন। কোথাও কাতার সোজা হওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে তা ঠিক করার জন্য তিনি অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ঘ. কাতার সোজা ও ফাঁকা পূরণ করার পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুস্পষ্ট হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের (রা.) আমল হতে প্রতীয়মান হয় জামা'আত অবস্থায় নামায আদায়কালে কাতার সোজা করার পদ্ধতি হলো নামাযীগণ পরস্পর কাঁধ বরাবর অথবা টাখনু বরাবর করে দাঁড়াবে। আর কাতারে একজন থেকে অপরজনের দূরত্ব বা ফাঁকা বন্ধ করার পরিমাণ হলো একজন অপরজনের সঙ্গে কমপক্ষে এতটুকু কাছাকাছি হয়ে দাঁড়াবে, যাতে করে দুজনের মধ্যে অপর কোনো একজন দাঁড়ানোর স্থান না থাকে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস পুনরায় আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত–
كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقولوا استووا۔
"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাঁধ ধরে বলতেন সোজা হও।" (সহীহ মুসলিম ১/১৮১ হা.৪৩২)

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق
"তোমাদের কাতারগুলো খুব মিলিয়ে

নাও এবং কাছাকাছি করো। এবং পরস্পর কাঁধ বরাবর করো।" (সহীহ ইবনে হিব্বান ৫/৫৩৯, হা. ২১৬৬)

৩. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

أقيموا الصفوف ـــ وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا فى ايدى اخوانكم ولاتذروا فرجات للشياطين

"তোমরা কাতার সোজা করো। তোমরা পরস্পর কাঁধ বরাবর রেখো। ফাঁকা স্থান বন্ধ করো। অপর ভাইয়ের হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াও। শয়তানের জন্য ফাঁকা স্থান রেখে দিও না। (আবু দাউদ ১/৯৭, হা. ৬৬৬)

উল্লিখিত হাদীসগুলোর ভাষ্য মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদের কাঁধ ধরে কাতার সোজা করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কাতার সোজা করো, পরস্পর কাঁধ বরাবর করো, ফাঁকা বন্ধ করো, শয়তানের জন্য ফাঁকা রেখে দিও না। ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বাণীর আলোকে সমস্ত হাদীস বিশারদ ইমামগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এসব বাক্যে জামা'আতবদ্ধ নামাযে সবাইকে যথাসম্ভব কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ করেছেন। তবে পায়ে পা উঠিয়ে দেয়া বা হাত দ্বারা হাত ধরে রাখা এমন কোনো নির্দেশনা নেই।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ইবনে হাজর আসকালানী, ইমাম নববীসহ হাদীসের উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যাকারকগণ সবাই এ বিষয়ে একমত। এমনকি আহলে হাদীস মতবাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা, আউনুল মাবুদ প্রণেতা আযীম আবাদী এবং ইমাম শাওকানী প্রমুখ ইমামগণ কেউই কোনো দ্বিমত পোষণ করেননি। ইমাম শাওকানীর ভাষ্য নিম্নরূপ–

اجعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلى موازيا منكب الآخر مسامتاله، فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد۔

"পরস্পর কাঁধ বরাবর করো। যাতে করে প্রত্যেক নামাযীর কাঁধ সমানভাবে থাকে। আগে বা পেছনে না হয়। তাহলে প্রত্যেকের কাঁধ, ঘাড় ও পা একই দিকে বরাবর হবে। (নাইলুল আওতার ৩/১৮৮)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় আরো স্পষ্টভাবে আলোচনার দাবি রাখে। বিষয়টি হলো মিলে মিলে দাঁড়ানোর পরিমাণ বা পদ্ধতি কী হবে। বস্তুত কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ এবং এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীস ভাণ্ডারের যাবতীয় হাদীস গবেষণা করে হাদীস বিশারদ বিজ্ঞ ইমামগণ ঐকমত্যে লিখেছেন, কাতারে নামাযীগণ পায়ের টাখনু বা গোড়ালি এবং কাঁধ বরাবর করে যথাসম্ভব কাছাকাছি হয়ে দাঁড়াবে। তা-ই হলো হাদীসের নির্দেশনা। তবে ইতিপূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

وسدوا الخلل، ولينوا فى أيدى إخوانكم ولاتذروا فرجات للشياطين

"ফাঁকা বন্ধ করো। অপর ভাইয়ের বাহুর সাথে বাহু মিলিয়ে দাঁড়াও। শয়তানের জন্য ফাঁকা স্থান রেখে দিও না।" (আবু দাউদ ১/৯৭, হা. ৬৬৬)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কাতারে ফাঁকা বন্ধ করার নির্দেশ করেছেন। আর ফাঁকা বন্ধ করার পদ্ধতি হিসেবে বলেছেন, একজনের বাহু অপরজনের বাহুর সাথে মেলালেই ফাঁকা বন্ধ হয়ে যাবে। আরো ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, শয়তানের জন্য ফাঁকা স্থান রেখে দিও না। এতে বোঝা যায় দুজনের মধ্যে অপর একজন দাঁড়াতে পারে এই পরিমাণ স্থান খালি রেখে দেয়াই হলো কাতারে ফাঁকা রেখে দেয়ার পরিমাণ। তাই দুজন অন্তর এই পরিমাণ কাছাকাছি হয়ে দাঁড়াতে হবে, যাতে করে তাদের মধ্যে অপর একজন কোনোভাবেই দাঁড়াতে না পারে। এই হলো কাছাকাছি বা মিলে মিলে তথা–ফাঁকা না রাখার ন্যূনতম পরিমাণ। (ফয়জুল বারী শরহে বুখারী ২/৩০২)

সাম্প্রতিককালে কতিপয় লোকজনদের নিজেদের পা ৩-৪ ফুট ছড়িয়ে দুই পাশের মুসল্লিদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে তাদের পায়ের সামনের অংশ উঠিয়ে দিতে দেখা যায়। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ কাজেই ব্যস্ত থাকে। নামাযীদেরকেও সঠিকভাবে নামায আদায় করার সুযোগ দেয় না, নিজেরাও একাগ্রতা ও ভয়-ভীতির সাথে নামায পড়ে না। তারা মনে করে পরস্পর পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি উঠিয়ে দিয়ে কাতারে ফাঁকা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ফাঁকা বন্ধ হলো না। মূলত তা ওদের নিছক ধারণা। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে একটি মাত্র হাদীসও নেই, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে দাঁড়াতে বলেছেন। অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কোনো একদিন এভাবে দাঁড়িয়েছেন। খুলাফায়ে রাশেদীন আবু বকর (রা.), উমর (রা.) উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী কারো থেকে এমন একটি বর্ণনাও নেই। আহলে হাদীস মতবাদ কর্তৃক ছড়ানো-ছিটানো বই-পুস্তক ও অমূলক কাগজপত্রে পরস্পর পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মিলিয়ে দাঁড়ানোর দলিল হিসেবে দুজন সাহাবীর দুটি উক্তি পেশ করে থাকে। এ পরিসরে তা উল্লেখ করে এর বাস্তব তথ্য

উপস্থাপন করা জরুরি মনে করি।

১. সাহাবী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত–

عن النبى ﷺ أقيموا صفوفكم فانى اراكم من وراء ظهرى وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা নামাযে কাতার সোজা করো। আমার পেছনে আমি তোমাদের দেখতে পাই। (সাহাবী আনাস (রা.) উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ পালনার্থে আমাদের কেউ কেউ কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম।" (সহীহ বুখারী ১/১০০, হা. ৭২৫)

২. সাহাবী নুমান ইবনে বাশীর থেকে একটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত–

فرايت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه

"আমি দেখলাম, লোকজন তার পাশের লোকের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু এবং টাখনুর সাথে টাখনু মিলাচ্ছে।" (আবু দাউদ ১/৯৭, হা.৬৬২) এই হাদীসের সূত্রে জনৈক বর্ণনাকারী যাকারিয়া বিন আবি যায়েদা সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ইমামগণ বলেন, كثير التدليس يدلس عن الضعفاء সে হাদীসের মূল বিষয়ে অতিমাত্রায় কারচুপির আশ্রয় নেয়। সে দুর্বল বর্ণনাকারীদের হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন করে। (তাদলীস ফিল হাদীস-২৯৮)

নিরসন :

১. উল্লেখ্য, হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু কাতার সোজা করার নির্দেশ করেছেন। পায়ের সাথে পা লাগানোর কোনো বিধান রাসূলুল্লাহ (সা.) এই হাদীসে বলেননি। হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারে সহীহ বা দুর্বল কোনো ধরনের হাদীস তাঁর থেকে আদৌ বর্ণিত নেই।

অবশ্য প্রথম হাদীসে সাহাবী আনাস (রা.) এবং দুর্বল সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে সাহাবী নুমান (রা.) সাহাবাগণের আমল বর্ণনা করেছেন। এর সঠিক ব্যাখ্যা হাদীসগ্রন্থসমূহে আছে। যারা সাহাবাগণের উক্তি ও আমল দলিল হিসেবে মানে তারা এসব উল্লেখ করার অধিকার রাখে। যারা তা মানেই না, তারা এসব উক্তি বা আমল উল্লেখ করার অধিকার রাখে না। আহলে হাদীস মতবাদের লোকজন সাহাবাগণকে মানে না। মানে না তাদের উক্তি ও আমলসমূহকে দলিল হিসেবে। যা আমার সংকলিত "তথাকথিত আহলে হাদীসের আসল রূপ" বইয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। তাই হযরত আনাস (রা.) এবং নুমান (রা.)-এর উক্তি দুটি কথিত আহলে হাদীস মতবাদের কেউ পেশ করারই অধিকার রাখে না। মূলত মুসলিম বিশ্বে অনুসৃত ঐক্যবদ্ধ একটি মতাদর্শে ফাটল সৃষ্টি করাই তাদের আসল লক্ষ্য।

২. আমি তাদেরকে বলব, হাদীসে তো পায়ের সাথে পা মিলানের কথা পেয়েছেন, কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু, টাখনুতে টাখনু এবং বাহুতে বাহু মিলানোর কথাগুলো আপনারা বর্জন করেছেন কী অজুহাতে? পায়ের সঙ্গেও আবার পূর্ণ পা না মিলিয়ে শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি মিলানো হয়–তা পেয়েছেন কোন হাদীসে? কাঁধ, হাঁটু, টাখনু ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি এসব কি একত্রে পরস্পর মিলিয়ে দেখেছেন? আর তা কি সম্ভব? অন্যথায় হাদীসের কিছু অংশ মানলেন আর কিছু বর্জন করলেন কোন দলিলের ভিত্তিতে? কোন ব্যাখ্যার আলোকে? তাই জেনে নিন বিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ইমামগণের সঠিক ব্যাখ্যা, বাস্তব মর্ম।

ক. বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) লিখেন–

الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فى الصف، المراد بذلك المبالغة فى تعديل الصف وسد خلله۔

"নামাযে কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোর মর্ম হলো, কাতার সোজা করা ও ফাঁকা বন্ধ করার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ করা। (ফাতহুল বারী ২/২৪৭)

পায়ে পা উঠানোর কোনো নির্দেশনা এতেও নেই রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত অন্য কোনো হাদীসেও নেই।

খ. যুগশ্রেষ্ঠ প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) লিখেন–

وهو مراده عند الفقهاء الأربعة اى أن لا يترك فى البين فرجة تسع فيها ثالثا۔

"কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোর মর্ম হলো, নামাযীগণ কাতারে পরস্পর এমনভাবে মিলে দাঁড়াবে, যাতে করে দু'জনের মধ্যে অন্য কেউ দাঁড়াতে সুযোগ না পায়। ফিক্বহের চার ইমামগণ এমন মর্মই বর্ণনা করেছেন। (ফয়জুল বারী শরহে বুখারী ২/৩০২)

তিনি আরো ব্যাখ্যা করে লিখেন–

সাহাবাগণ পরস্পর কাঁধ, হাঁটু, টাখনু ও পা ইত্যাদি মিলিয়ে দাঁড়াতেন এর অর্থ জোড়া বা লাগিয়ে রাখতেন এমন নয়। যদি কেউ বলেন করিম ও রহিম মিলে আছে। এর মর্ম এমন নয় যে, তারা লেগে লেগে আছে। বরং এর অর্থ হলো, তারা কাছাকাছি আছে। ঠিক এভাবে পরস্পর কাঁধ, হাঁটু, টাখনু ও পা মিলে থাকার অর্থ হলো এগুলো কাছাকাছি করে বরাবর রেখে দাঁড়ানো। (প্রাগুক্ত ২/৩৩৬)

আহলে হাদীস মতবাদের শীর্ষ ইমাম শাওকানীও এমন অর্থই উল্লেখ করেছেন। (নাইলুল আওতার ৩/১৮৮)

পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির সাথে কনিষ্ঠাঙ্গুলি লাগানোর জন্য আহলে হাদীস মতবাদের লোকজন জামা'আতে নামায আদায়কালে নিজেদের পা দু'টি ছড়িয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাশ্মিরী (রহ.) লিখেন–

إنا لا نجد الصحابة والتابعين يفرقون فى قيامهم بين الجماعة والإنفراد، علمنا إنه لم يرد بقوله إلزاق المنكب الا التراص وترك الفرجة

"সাহাবী ও তাবেঈগণ নামাযে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে জামা'আতে বা একাকী নামাযের বেলায় কেউ কোনো পার্থক্য করেছেন তা আমরা মোটেই পাইনি। তাই কাঁধে কাঁধ মিলানোর অর্থ অতি গুরুত্বসহকারে কাতার সোজা করা ও কাতারে কোনো ফাঁকা না রাখা বৈ আর কিছুই নয়। (ফয়জুল বারী শরহে বুখারী ২/৩০২)

উল্লেখ্য, যে নামাযী তার দুই পা কয়েক ফুট ছড়িয়ে রাখবে এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে কোনো একটি মাত্র হাদীস বা তাঁর কোনো আমল হাদীসের ভাণ্ডারে উল্লেখ নেই। সাহাবা তাবেঈগণের আমলেও তা খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তিকে তার পা দুটি অস্বাভাবিকভাবে লাগিয়ে দাঁড়াতে দেখে তিনি বলেন,

خالف السنة ولو رواح بينهما كان أفضل

" সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত তরিকার ব্যতিক্রম করেছে। স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দাঁড়ালে ভালো হতো।" (নাসাঈ সুনান ১/১১৪ হা. ৮৯৩)

শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম এমন স্বাভাবিক ফাঁকা রেখে নামাযে দাঁড়ানোকে তিনি সুন্নাত হিসেবে গণ্য করেছেন, চাই তা একাকী নামাযই হোক বা জামা'আতে নামাযই হোক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, যারা একাকী ও জামা'আতে নামাযের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে দাঁড়ানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, এর দলিল-প্রমাণ কী? জামা'আতে নামায পড়া অবস্থায় পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর হাদীসগুলো কোথায়? এ অধ্যায়ে আমাদের উল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের বিরোধিতা কেন? কী রহস্য গোটা মুসলিম মিল্লাতের বিরোধ করার? সব প্রশ্নের একই উত্তর। সাধারণ মুসলমানদের বিব্রত করে তাদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। তাই মুসলমানদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। প্রয়োজন কুরআন-সুন্নাহর সঠিক তথ্য গভীরভাবে গবেষণার।

আত্মশুদ্ধির পথে মাসিক আল-আবরারের স্বার্থক দিকনির্দেশনা অব্যাহত থাকুক

টাইলস এবং সেনিটারী সামগ্রীর বিশ্বস্ত ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

Importers & General Marchant of Sanitary Goods & Bath Room Fittings

J.K SANITARY

25/2 Bir Uttam C.R. Dutta RoadHatirpool, Dhaka, Bangladesh.
E-mail: taosif07@gmail.com
Tel: 0088-029662424, Mobile: 01675303592, 01711527232

Rainbow Tiles

2, Link Road, Nurzahan Tower, Shop No: 0980/20 Mymansing Road, Dhaka, Bangladesh
Tel : 0088-02-9612039, Mobile : 01674622744, 01611527232
E-mail: taosif07@gmail.com

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

মুসলিম সমাজে মাদরাসা শিক্ষার প্রভাব

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী

শুরুলগ্নে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা কাঠামো

বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন এক সমতল ভূমিতে শুরু করেছিলেন, যাতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না। বর্তমানের ন্যায় শিক্ষার উপকরণ তো দূরের কথা, সেখানে রৌদ্র-ঝড় থেকে বাঁচার জন্য ছাদেরই ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও রান্নাবান্নার কোনো আয়োজন হতো না। ছিল না কোনো রন্ধনশালাও। লোকেরা গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর এক স্থানে একত্রিত করত। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) স্বীয় প্রয়োজন অনুমানে কিছু খেজুর খেয়ে অবশিষ্টগুলো অন্যদের জন্য রেখে দিতেন। জীবন উপকরণের মাধ্যম হিসেবেও সেসব খেজুর ছিল খুবই অপ্রতুল, সীমিত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কখনো কখনো ক্ষুধার তাড়নায় বেহুঁশ হয়ে যেতেন। তিনি সেই দুঃসহ, বিভীষিকাময় দিনের স্মৃতিচারণা করেন এভাবে, বারবার আমাকে অবচেতন হতে দেখে মানুষ আমাদের মৃগী রোগী ভাবত। প্রাথমিক চিকিৎসাস্বরূপ তারা আমার গ্রীবাদেশে পা রেখে রেখে অতিক্রান্ত হতো। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মৃগী রোগী ছিলাম না। মূর্ছা রোগ আমাকে কখনোই স্পর্শ করেনি। বরং প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় আমি অচেতন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তাম। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এত বিশাল কুরবানী ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই দ্বীনের পবিত্র আমানত আমাদের কাছে সমর্পিত করেছেন। পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের অবধি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর একাদশ হিজরীতেই নবুওয়াতের সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ফলে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে রাসূল (সা.)-এর সাহচর্য, সান্নিধ্য লাভ করতে পারেননি। কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে অনেক বেশি ফয়েজ প্রাপ্ত হয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি গৌরবোজ্জ্বল আসনে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা-৫৩৬৪।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের দিক থেকে যা অন্যদের চেয়ে বেশি। বর্তমান যুগেও যেসব মাদরাসা দেখা যায়, যদিও সেগুলোতে জমকালো প্রাসাদ নেই। স্থাপত্যশিল্পের কারুকার্য নেই। বাহারি রঙের মেলা নেই। বসার সুবন্দোবস্ত নেই, উন্নত চট, সোফা বা কার্পেট নেই। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে বসে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একটি সুদৃঢ় নিসবত কায়েম হয়। আর এ নিসবত আল্লাহর এত বড় নেয়ামত, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা যাবে না।

শিক্ষক ব্যতীত সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায় না

দ্বীনের ইলম আমাদের নিকট পৌঁছার প্রক্রিয়াটা কী ছিল? প্রত্যেকেই আদবের সাথে, নতজানু হয়ে, ছাত্রসুলভ আচরণগুলো অনুসরণ করে সেসব শিক্ষকদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন, যাদের সনদ ও জ্ঞানের পরম্পরা রাসূল (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। একটি কিতাব নিজে অধ্যয়ন করে অন্যটি কোনো কামেল উস্তাদের কাছে পাঠ করলে উভয়ের মধ্যকার আসমান-জমিনসম ব্যবধান দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। উস্তাদ ছাড়া ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের বিষয়টি মহামারির আকার ধারণ করেছে। মানুষের মাঝে জ্ঞান অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও পৃথিবীকে জানার অদম্য প্রেরণা মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছে। ফলে নিত্যনতুন ইজতেহাদ, গবেষণাই শুধু হয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষক ব্যতীত নিজে নিজে পাঠ করে যদি ইলম অর্জন করা যেত, তাহলে আসমানী কিতাবসমূহের সাথে কোনো রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো না। আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজসাধ্য ছিল যে, কোনো এক রাতে প্রতিটি মুসলমানের শায়রে শায়রে কুরআনের সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত এক একটি কপি রেখে দেওয়া হতো, আর অদৃশ্য থেকে ডাক দিয়ে বলা হতো, এ গ্রন্থটি গ্রহণ করো, একে পাঠ করো, এর ওপর আমল করো। কিন্তু এমনটি করা হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সঙ্গে কুরআনের ব্যাখ্যাদাতাস্বরূপ হুজুর আকরাম (সা.) কে পাঠিয়েছেন। আর বলেছেন, রাসূলের অন্যতম দায়িত্ব হলো, তিনি তাদের কিতাবের শিক্ষাদান করবেন। এভাবেই প্রতিটি আসমানী গ্রন্থের সঙ্গে একেকজন করে রাসূল

পাঠানো হয়েছে। বরং এমন হয়েছে, নবীগণ এসেছেন, কিন্তু তাঁদের কোনো আসমানী গ্রন্থ দেওয়া হয়নি। কিন্তু এমন ঘটনা কখনোই ঘটেনি যে, আসমানী গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো রাসূল প্রেরিত হননি। এর কারণ হলো, শিক্ষক ও প্রশিক্ষক ব্যতীত কিতাব ও গ্রন্থ মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহর কিতাব নিজে নিজে অধ্যয়ন করে মানুষ যখন এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনের অক্ষম হয়ে যেত, তখন তারা গুমরাহও পথভ্রান্ত হয়ে পড়ত। বিষটির দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানে রচিত অনেকগুলো বই পাঠ করে, অতঃপর হাসপাতাল, চেম্বার ও ক্লিনিক খুলে বসে, তাহলে সে কবরস্থান আবাদ করা ব্যতীত মানবতার কোনো সেবাই করতে পারবে না। তার সে চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান মানবতাকে ক্রমেই মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের সান্নিধ্য অর্জন ব্যতীত সে রাষ্ট্রীয় সনদ, ডিগ্রি বা স্বীকৃতিও অর্জন করতে পারবে না। ঠিক তেমনিভাবে দ্বীনি শিক্ষার জন্যও কোনো দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও মুরুব্বির সংস্পর্শে আসতে হবে। ছাত্রসুলভ সীমাবদ্ধতাগুলো অনুসরণ করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অন্যথায় বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

জীর্ণ মাদরাসাগুলোর অসামান্য সক্ষমতা ও শক্তিমত্তা

শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মাদরাসাগুলো দেখা যায়, অনেকটা জীর্ণ, শীর্ণ, পুরনো বিধ্বস্ত কাঠামোতে বিদ্যমান। কিন্তু এসব মাদরাসার শান, মান, মর্যাদাও মাকাম আল্লাহর নিকট অনেক বেশি। এসব মাদরাসার বদৌলতে আজো পৃথিবীতে কালেমার ধ্বনি শোনা যায়। ঈমানের ডাকে অদৃশ্যের আহ্বানে মানুষ সাড়া দেয়। এ মাদরাসাগুলোর কারণেই এখনো পৃথিবীতে আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রয়েছে। সর্বোপরি দ্বীন-ধর্মকে তার প্রকৃত রূপ, অবয়ব ও কাঠামোতে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বটিও এ মাদরাসাগুলো পালন করে আসছে। সেসব দেশে গিয়ে দেখুন; যেখানে এসব মাদরাসাগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে। সেসব দেশ ধর্মহীনতার বাঁধভাঙ্গা স্রোতে প্লাবিত। নাস্তিক্যবাদের মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত। অথচ বাঁধ রক্ষার উদ্যোগী কেউ নেই। বিপন্ন মানবতার কোনো ত্রাণকর্তা নেই। হযরত আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর ভাষায়, 'রিদ্দাতুন, ওয়ালা আবা বাকরিন লাহা। ধর্মত্যাগের ফেতনা প্রকট আকার ধারণ করেছে, অথচ এর প্রতিরোধে নেই কোনো আবু বকর (রা.)।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে পৃথিবীর অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে যাওয়া এবং সেখানকার আহলে ইলম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। প্রথমে তো অন্ধভাবে এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম যে, এ সমস্ত দ্বীনি মাদারেস যেগুলোর সম্পর্ক উলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। কিন্তু সেসব দেশের অবস্থা চর্মচোখে অবলোকন ও অন্তরের চোখে পর্যবেক্ষণের পর প্রমাণিকভাবেই এ সত্য আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, দ্বীনের হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব দ্বীনি মাদরাসা সৃষ্টি করেছেন। বাহ্যিকভাবে এসব মাদরাসা যতই জীর্ণ, শীর্ণ ও সাদাসিধে হোক না কেন, মুসলিম সমাজে এসব মাদরাসার বরকত, প্রভাব-প্রতিপত্তি আলহামদুলিল্লাহ আজো দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

এক বিশ্ব পর্যটকের চোখে মাদরাসাবিহীন দেশ ও সমাজ

যেসব দেশে ও সমাজে এসব মাদরাসা নেই, সেখানে আমলহীনতাও পথভ্রষ্টতার আশ্চর্য অবস্থাও দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি অদ্ভুত ও কল্পনাতীত দৃশ্যও চোখে পড়েছে যে, মুখে সিগারেট, গলায় টাই ঝোলানো, শ্মশ্রুমুণ্ডিত 'ক্লিন সেভ' করা, পাশ্চাত্যের অনুকরণে পোশাক পরিহিত একজন ব্যক্তি বোখারী শরীফের দরস দিচ্ছেন! এমন দৃশ্যও চোখে পড়েছে, বোখারী শরীফের পাঠদান চলছে, অথচ নামাযের খবর নেই। আরো অবাক হওয়ার কথা হলো, নর-নারীর অবাধ মেলামেশা হচ্ছে, সহশিক্ষা চলছে। তারা শিখছে ইসলামের জ্ঞান বিধিবিধান! এসব সত্যের আমি প্রত্যক্ষদর্শী।

ইরাকে ধর্মীয় শিক্ষার সেকাল-একাল

কিছুদিন আগে আমি ইরাক সফরে গিয়েছিলাম। এখন তো সেখানকার অবস্থা খুবই ভয়াবহ। সেখানে কোনো কোনো সতীর্থ, শুভানুধ্যায়ী, বন্ধুকে আমি বললাম, প্রাচীন নিয়মে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। এ চিন্তার উদয় হওয়ার কারণ হলো, সেখানে আলেম, সূফি, দরবেশ ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে ধরে ধরে সমূলে হত্যা করা হয়েছে। কোনো এক হিতাকাঙ্ক্ষী বলল, বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মাজারের পাশে একটি মাদরাসা রয়েছে। সেখানে প্রাচীন নিয়মে পড়ুয়া একজন বুজুর্গ, আলেম রয়েছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করুন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, বাস্তবেই সেখানে এক প্রবীণ বুজুর্গ রয়েছেন, যাঁর চালচলন, কথা বলার ধরন আচার-আচরণের মধ্যে আসলাফ ও আকাবেরের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান, দৃশ্যমান। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, পাকিস্তানে আমি কী করি? আমি বললাম, আমি দারুল উলুম করাচি নামে এক মাদরাসায় কর্মরত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত? আমি বললাম, আমাদের এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো এমন নয়, বরং এগুলো কওমী মাদরাসা। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হতবিহ্বল হয়ে চলতে লাগলেন। ওই ধরনের মাদরাসার কল্পনাও তো আমরা ভুলে গেছি। এটা তো আপনাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। আচ্ছা বলুন তো, সেখানে কী কী পড়ানো হয়? আমি দরসে নেজামীর কিছু কিতাবের নাম বললাম। যেমন শরহে জামী, সুল্লাম ইত্যাদি। এসব কিতাবের নাম শুনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমাকে নসিহত করছি, যত দিন তোমাদের দেহে প্রাণ থাকবে, তোমাদের বদনে দম থাকবে, তত দিন এ নেসাব ও পাঠ্যসূচিকে ছেড়ে দেবে না। কেননা, আমাদের ইরাকে যখন সে নেসাবের কিতাবাদী পড়ানো হতো, তখন পরিবেশ এখনকার চেয়ে ভিন্ন ছিল। মানুষের মাঝে ঈমান-আমল বিদ্যমান ছিল। আলেমগণ সুন্নাতের অনুসারী ছিল। ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি জযবা ও ঈমান চেতনা সৃষ্টি হতো। যখনই ইউনিভার্সিটির শিক্ষাব্যবস্থা চালু হলো, ধর্মীয় কিতাবগুলো সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হলো, তখনই দৃশ্যপট বদলে গেল। মাদরাসাগুলো সরকারের অধীনে চলে গেল। ফলশ্রুতিতে দরবারী ও সরকারি আলেম তৈরি হতে লাগল।

মাদরাসা শিক্ষা বিষয়ে হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর মূল্যায়ন

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) বর্তমান বিশ্বের একটি আলোচিত নাম। তাঁর এখলাস, লিল্লাহিয়্যাত ও একনিষ্ঠতাও সর্বজনবিদিত। তিনি আল্লাহর নিকট এতই মকবুল ও মনোনীত যে, তাঁর লিখিত ফাজায়েলের কিতাবসমূহ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে, দুনিয়ার কোথাও না কোথাও তা পাঠ করা হয় না। তিনি একদা দারুল উলুম করাচিতে তাশরিফ এনেছিলেন। আমরা আরজ করলাম, হযরত! আমাদের কিছু নসিহত করুন। তিনি কেবল একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন, তালেবে ইলম বন্ধুরা! নিজেদের হাকিকত ও পরিচয় জেনে নাও। নিজেদের মর্যাদা চিনে নাও। অর্থাৎ কখনো কখনো তোমাদের অন্তরে এ খেয়াল আসতে পারে যে, পৃথিবী এগিয়ে চলছে, সভ্যতার চাকা খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমরা এখনো চট ও চাটাইয়ের ওপর বসে আছি! স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মহান নেয়ামত দান করেছেন, তার মোকাবিলায় দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-দৌলত কিছুই নয়। আর সে নেয়ামত হলো, রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে নিসবত। আমরা "হাদ্দাছানা ফুলানুন হাদ্দাছানা ফুলানুন আন ফুলানিন আন রাসূলিল্লাহি (সা.)" পাঠ করে রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপন করছি, এর মর্যাদা ও মূল্য আজ বুঝে আসবে না। মৃত্যুর পরেই বুঝে আসবে, এ নিসবত ও সিলসিলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আল্লাহর কত বড় নেয়ামত!

আরেফ বিল্লাহ ডা. আব্দুল হাই (রহ.)-এর অভিমত

আমার শায়খ ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, মনে করুন, করাচি থেকে রাষ্ট্রপ্রধানের বহর নিয়ে একটি ট্রেন যাচ্ছে। যার মধ্যে উন্নত পান্থশালাও রয়েছে। উন্নত পারফিউম ও সুগন্ধিতে সুবাসিত পরিবেশ। এতে জমকালো ও অভিজাত শ্রেণীর বগি লাগানো হয়েছে। পানাহারেরও রয়েছে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে স্টেশন মাস্টার একটি পুরনো বগিও এর সঙ্গে জুড়ে দিল। এ বগিটিও কিন্তু অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছবে। ঠিক তেমনি আমাদের অবস্থা যতই জীর্ণ, পুরনো হোক না কেন, আমাদের সনদ রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই নিসবত ও সম্পর্কের দরুন আমাদের ওপর আল্লাহর অগণিত রহমত বর্ষিত হবে। এ জন্য আমাদের উচিত, এ সিলসিলায়ে সনদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা। ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও অন্যদেরও এ মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার সুযোগ রয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যাকে ভালোবাসে, তার সঙ্গেই সে পরকালে থাকবে। যদি কেউ এই সিলসিলার লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে, তবে সেও তাদের সঙ্গে পরকালে উত্থিত হবে। তাই নিজেও সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে, অন্যদেরও এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব মাদরাসার মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

ভাষান্তর : মাওলানা কাসেম শরীফ

সূত্র : www.deeneislam.com

ইসলামী অর্থনীতি

মুদ্রার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও শরয়ী বিধান-১৩

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

Bank Note বা Token Money এর বিনিময় বাঈ অনর্ভুক্ত হবে কি না?

Bank Note বা Token Money এর শরয়ী অবস্থান বিষয়ে পূর্বের আলোচনায় আমরা সবিস্তারে পাঠক মহলের সামনে পেশ করেছি। ওই বিষয়ে মূলত চারটি দৃষ্টিভঙ্গি। (১) Bank note হলো ঋণ (Debit) সার্টিফিকেট (২) Bank note হলো, পণ্য বা Goods (৩) Bank note হলো স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত বা Substitute (৪) Bank note হলো, প্রথাগত ছমন এবং পয়সার মতো।

উক্ত মাসআলাটা বর্ণিত চারটি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল বিধায় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার ধরণ মাসআলাটাও মতানৈক্যপূর্ণ।

তাই যেই সমস্ত ফকীহগণ প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তাঁদের নিকট Bank note এর লেনদেনে বাঈ ছরফের কল্পনাও করা যায় না। কেননা বাঈ ছরফের মধ্যে বিনিময়দ্বয়ের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ করা জরুরি। অথচ নোটের কবজ করা আসলের ওপর কবজ নয়। বরং তার সার্টিফিকেটের ওপর কবজ। সুতরাং বিনিময় ক্ষেত্রে আসলের ওপর তাৎক্ষণিক কবজ পাওয়ায় যাবে না। তাই বাঈ ছরফও হবে না।

প্রসিদ্ধ ফাতাওয়াগ্রন্থ ইমদাদুল ফাতাওয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

প্রশ্ন– যদি কোনো ব্যক্তি এক শ টাকা হাতে হাতে অন্য কারো সাথে এক শ থেকে কম বা বেশির বিনিময়ে বিক্রি করে বৈধ হবে কি না?

উত্তর– Bank note এর লেনদেন হলো, হাওয়ালা, ক্রয়-বিক্রয় নয়। সুতরাং উক্ত লেনদেন হারাম এবং সুদ। কম-বেশ করা অবৈধ। (৩/৭৬) অপর এক বিস্তারিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেন Bank note এর বাস্তবতা হলো হাওয়ালা। এবং হাওয়ালার মধ্যে কম-বেশ করা সুদ। যদি তা শর্ত সাপেক্ষে বা প্রথাগতভাবে হয়ে থাকে। (প্রাগুক্ত)

ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, যা আযিযুল ফাতাওয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ এতে এক প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ রয়েছে যে, নোটের মধ্যে উল্লেখিত মূল্যমানের চেয়ে কম-বেশ করার মাধ্যমে বাঈ অবৈধ। এবং বাস্তবে ব্যাংক নোটের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না বরং এতে হাওয়ালা পদ্ধতিতে হাত বদল হতে থাকে। (পৃ: ৬৩৬)

ফাতাওয়া রশিদিয়াতে উল্লেখ আছে যে,

প্রশ্ন– নোটের ক্রয়-বিক্রয় কম-বেশ করে বৈধ হবে কি না?

উত্তর– নোটের ক্রয়-বিক্রয় তার মূল্যের ওপরও বৈধ নয়। তবে এতে হাওয়ালা হতে পারে। এবং চুক্তির মাধ্যমে হাওয়ালা বৈধ। কিন্তু কম-বেশ করে ক্রয়-বিক্রয় করা সুদ এবং অবৈধ। (পৃ: ৪০০)

ভারত উপমহাদেশের উক্ত ফকীহদের নিকট Bank note যেহেতু ঋণের সনদ বা Dabit Certificate তাই তাদের নিকট Bank note এর মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধই হবে না। সমতার ভিত্তিতেও না অতিরিক্ততার ভিত্তিতেও না। তবে কেউ যদি ব্যাংক নোটের ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে, তাহলে তাকে হাওয়ালা আখ্যায়িত করে উক্ত লেনদেনকে বৈধতা দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, উক্ত লেনদেন সমতার ভিত্তিতে হতে হবে।

হাওয়ালা আখ্যায়িত করার বিশ্লেষণ হলো এই যে, উদাহরণস্বরূপ ক, খ কে একটা দশ টাকার নোট প্রদান করছে এর অর্থ হলো, ক নিজের ঋণ খ কে হস্তান্তর করছে। এবং খ, ক কে দশ টাকার নোট প্রদান করার মাধ্যমে তার ঋণ ক কে হস্তান্তর করছে প্রকারান্তরে উভয়ে উভয়ের ঋণ উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে একে অপরকে হাওয়ালা করল। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন কম-বেশ করা বৈধ হবে না, হাওয়ালাতেও কম-বেশ করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী ফকীহগণ যাদের মতে Bank note পণ্য বা Goods এর হুকুমে, তাদের নিকটও ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ নয়। কেননা বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য বিনিময়দ্বয় নকদ বা প্রকৃতিগত মুদ্রা হওয়া আবশ্যকীয়। তাই বাঈ ছরফ তাদের মতে শুধুমাত্র স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উক্ত মতামত ভারত উপমহাদেশের ফকীহদের মধ্যে রায়পুরের ওলামায়ে কেরাম এবং আহমদ রেজা খান বেরলভীর।

তিনি তাঁর স্বরচিত পুস্তিকায় লিখেন–

سوال : هل يجوز بيع النوت بازيد من رقمه او انقص؟ فاقول: نعم يجوز بيعه بازيد من رقمه وبانقص منه كيفما تراضيا (الى قوله) نص علماء نا قاطبة ان علة حرمة الربا القدر المعهود بكيل او وزن مع الجنس فان وجد احرم الفضل والنساء، وان عدما، حلا، وان وجد احدهما حل الفضل وحرم النساء، وهذه قاعدة غير منخرمة وعليها تدور جميع فروع الباب، ومعلوم ان لا اشتراك فى النوت والدراهم فى جنس

ولا قدر اما الجنس فلان هذا قرطاس، وتلك فضة، واما القدر فلان الدرهم موزونة ولا قدر للنوت اصلا لا مكيل ولا موزون، فيجب ان يحل الفضل ، والنساء جميعا، فاذن ليس النوت من الاموال الربوية الخ (كفل الفقيه الفاهم فى احكام القرطاس والدراهم ٦٤)

অর্থাৎ **প্রশ্ন**– নোটের ক্রয়-বিক্রয় তাতে উল্লিখিত মূল্য থেকে কম-বেশ করে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আমার মতামত হলো, ব্যাংক নোটের ক্রয়-বিক্রয় তাতে উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে কম-বেশ করে ক্রেতা-বিক্রেতা যেভাবেই সম্মত হয় সেভাবে বৈধ হবে। আমাদের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সুদ হারাম হওয়ার জন্য ইল্লাত তথা মূল কারণ হলো, 'কদর' তথা পরিমাপ এবং জিনিস তথা- রকম, প্রকার উভয়টা যদি কোনো বস্তুতে পাওয়া যায় তাহলে এতে অতিরিক্ততাও বিলম্বে পরিশোধ উভয়টা অবৈধ হবে। যদি কোনো বস্তুতে উভয়টা ইল্লাত অনুপস্থিত থাকে তাহলে উক্ত বস্তুর লেনদেনে কোনো প্রকারের সুদ হবে না। বরং অতিরিক্ততাও বিলম্বে পরিশোধ উভয়টা বৈধ হবে। আর যদি কোনো বস্তুর মধ্যে ইল্লাতদ্বয়ের যেকোনো একটা পাওয়া যায় তাহলে উক্ত বস্তুর লেনদেনে অতিরিক্ততা বৈধ হবে। বিলম্বে পরিশোধ অবৈধ হবে। উপর্যুক্ত মূলনীতিটা হলো, একটা অটুট মূলনীতি। এর ওপরই সুদের আনুষঙ্গিক সব মাসআলার বুনিয়াদ। এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে Bank note এবং দিরহামের মধ্যে সমজাত বা প্রকার হওয়ার মধ্যে কোনো প্রকারের মিল নাই কেননা Bank note হলো একটা কাগজ এবং দিরহাম হলো রৌপ্য। তদ্রূপ পরিমাপের মধ্যে দিরহামের সাথে ব্যাংক নোটের কোনো মিল নাই। কেননা দিরহাম হলো, পরিমাপযোগ্য একটি বস্তু অথচ ব্যাংক নোটের কোনো ওজনই নেই। তাই ব্যাংক নোটের লেনদেনে অতিরিক্ততা ও বিলম্বে পরিশোধ উভয়টা বৈধ হওয়া প্রমাণিত। সুতরাং ব্যাংক নোট কোনো প্রকারের সুদি বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফাতাওয়া রিজভীতে এক প্রশ্নের উত্তর শেষে তিনি লিখেন পূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি অনুসারে ব্যাংক নোটের লেনদেনে অতিরিক্ততা ও বিলম্বে পরিশোধ উভয়টা বৈধ হওয়া চায়। (৭/২৪৫, ছরফ অধ্যায়)

ফাতাওয়া সা'দিয়াতে উল্লেখ আছে যে,

فتعين انها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان وجواز بيع بعضها ببعض متماثلا او متفاضلا من جنس او اجناس الخ

অর্থাৎ এটাই প্রমাণিত হলো যে, Bank note হলো পণ্য বা Goods অন্যান্য পণ্যের মতো এতেও কম-বেশ করা বৈধ হবে। উভয়টা সমজাতীয় হোক বা ভিন্নজাতীয়।

শায়খ সোলাইমান আলহামদান তাঁর এক ফাতাওয়ায় লিখেন–

اذا علم هذا فلا مانع من بيع الورق على اختلاف انواعه ومسمایاته من الريالات او الدنانير او الجنيهات باحد النقدين باحد النقدين الذهب والفضة متفاضلا او نساء ولا دخل للربا فى شئ من ذلك لان الورق ليس من الاموال الربوية ولان الربا مختص بالمكيلات والموزونات والورق ليس بمكيل ولا موزون- (جريدة البلاد السعودية العدد ٢٩١٧)

সারমর্ম হলো, Bank note এর লেনদেনের সাথে সুদের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা ব্যাংক নোট সুদ সম্বন্ধীয় কোনো মাল নয় এবং তা এ জন্যও যে সুদ কেবল পরিমাপীয় বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ অথচ ব্যাংক নোট পরিমাপযোগ্য কোনো জিনিসই নয়।

ব্যাংক নোটসংক্রান্ত তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তা স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের বিকল্প বা Substitute এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ফকীহগণ বলেন যে, ব্যাংক নোটের বিধান হুবহু স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধানের মতো। তাই ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহ.)-এর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। এবং তাঁর মতে ব্যাংক নোট ছমন। এর ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধান প্রযোজ্য হবে। পয়সার বিধান নয়। ব্যাংক নোট বিষয়ে তিনি লিখেন যে–

پس پیسے (فلوس) اگرچہ عرفاً ثمن ہیں، مگر عین ثمن خلقی نہیں سمجھے گئے ہیں، بخلاف نوٹ کے کہ یہ عین ثمن خلقی ہے، گو ثمنیت خلقیہ نہیں، بلکہ ثمنیت عرفیہ ہو، پس تفاضل بیع فلوس میں جائز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نوٹ میں بھی جائز ہو، کیونکہ پیسے غیر جنس ثمن ہیں، حقیقۃً بھی اور عرفاً بھی، گو بوجہ اصطلاح اور عرف کے اس میں بھی ثمنیت کی صفت آ گئی ہو، پس جبکہ نوٹ عرفاً جمیع احکام میں عین ثمن خلقی سمجھا گیا، باب تفاضل میں اسی بنا پر حکم دیا جائے گا، اور تفاضل اس میں حرام ہوگا۔ (مجموعہ فتاوی لکھنوی ۲/ ۱۳۷)

অর্থাৎ পয়সা যদিও প্রথাগত ছমন, তবে তাকে মূল প্রাকৃতিক ছমন মনে করা হয়নি। পক্ষান্তরে ব্যাংক নোট মূল প্রকৃতিগত ছমন। যদিও তার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে ছমন হওয়ার যোগ্যতা-বৈশিষ্ট্যতা অনুপস্থিত বরং তার ছমন হওয়াটা প্রথাগতভাবে। তাই পয়সার লেনদেনে অতিরিক্ততা বৈধ হওয়া ব্যাংক নোটের মধ্যে তার বৈধতাকে আবশ্যক করে না। কেননা পয়সা হলো, ছমনের বিপরীত জাত ও প্রকার। প্রথাগতভাবে ও প্রাকৃতিকভাবেও, যদিও পরিভাষাও রেওয়াজের কারণে তার মধ্যেও ছমন হওয়ার বৈশিষ্ট্যতা সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক নোটকে যেহেতু সর্বক্ষেত্রে উরফ ও

প্রথার কারণে মূল প্রাকৃতিক ছমন মনে করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই এতে এর ভিত্তিতে অতিরিক্ততা হারাম হবে।

শায়খ আব্দুর রজ্জাক আফীফি বলেন–

لما كان الامر كذلك كانت الاوراق النقدية بدلا عما حلت محله من عملات الذهب او الفضة التى سبقتها فى التعامل--- وعلى هذا تجب فيها الزكوة كاصلها ويقدر فيها النصاب بما قدر بها فى اصلها وتجرى فيها ربا الفضل والنسيئة- (احكام الاوراق النقدية والتجارية للجعيد ٢١٤)

সারমর্ম– ব্যাংক নোট যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রার বিকল্প। তাই এর ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের সব বিধান প্রযোজ্য হবে। এবং ব্যাংক নোটের মধ্যে অন্যান্য বিধানের মতো বিনিময়সংক্রান্ত সুদ ও বিলম্বজনিত সুদ উভয়টা জারি হবে।

উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ হতে পারে।

ব্যাংক নোটবিষয়ক চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি হলো, তা প্রথাগত ছমন এবং পয়সার বিধানে। উক্ত মতানুসারীদের নিকট ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ নয়।

সারকথা– মত চতুষ্টয়ের মধ্যে শুধুমাত্র তৃতীয় মতানুসারে ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ অবশিষ্ট তিন দৃষ্টিভঙ্গি মতে ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ নয়। এবং বাঈ ছরফ না হওয়ার কারণও ভিন্ন ভিন্ন।

যথা- প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ব্যাংক নোটের ওপর কবজ হলো, ঋণের সার্টিফিকেটের ওপর কবজ। তাই কবজের অনুপস্থিতির কারণে বাঈ ছরফ কেন সাধারণ বাঈও সংঘটিত হয়নি বরং উক্ত লেনদেন হবে হাওয়ালা। দ্বিতীয় মতানুসারে ব্যাংক নোট যেহেতু পণ্য বা Goods এর হুকুমের মধ্যে। তাই বাঈ ছরফের সংজ্ঞা এর ওপর প্রযোজ্য হয় না। চতুর্থ মতানুসারে ব্যাংক নোট যদিও প্রথা ও প্রচলনগত মুদ্রা। তবে বাঈ ছরফ হওয়ার জন্য যেহেতু প্রকৃতিগত ছমন হওয়া জরুরি। ব্যাংক নোট প্রকৃতিগত ছমন নয় তাই এর লেনদেন বাঈ ছরফ হবে না। তৃতীয় মতানুসারে যেহেতু ব্যাংক নোট স্বর্ণ-রৌপ্যের বিকল্প বা substitute তাই মূলের যে বিধান বিকল্পের ও একই বিধান হয় বিধায় ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ হবে। যাহোক চতুর্থ মতানুসারেও ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ নয়। বিচারপতি আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী বলেন–

ثم ان هذه الاوراق النقدية وان كان لايجوز فيها التفاضل ولكن بيعها ليس بصرف، لان الاوراق النقدية ليست اثمانا خلقية وانما هى اثمان عرفية و اصطلاحية ولا يجرى الصرف الا فى الاثمان الخلقية من الذهب والفضة- (احكام الاوراق النقدية ٢٧)

অর্থাৎ অতঃপর ব্যাংক নোটের মধ্যে যদিও অতিরিক্ততা বৈধ নয়। কিন্তু এর লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় বাঈ ছরফ নয়। কেননা ব্যাংক নোট প্রকৃতিগত ছমন নয় বরং তা হলো পারিভাষিক এবং প্রথাগত ছমন। অথচ বাঈ ছরফ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ছমন অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে হয়ে থাকে।

সৈয়দ মুহাম্মদ বাকের তাঁর স্বীয় কিতাবে ব্যাংক নোটের লেনদেন বিষয়ে উল্লেখ করেন যে,

وعمليات البيع والشراء هذه جائزة شرعا سواء كانت حاضرة او لاجل- (البنك اللاربوى فى الاسلام (١٣٨)

অর্থাৎ ব্যাংক নোটের লেনদেন ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। নগদে হোক বা বাকিতে। উক্ত বক্তব্যে তিনি ব্যাংক নোটের লেনদেন বাকিতেও বৈধ বলেছেন। সুতরাং এটা বাঈ ছরফ নয়।

সৌদি আরবস্থ রিয়াদ দারুল ইফতার সদস্য শায়খ আব্দুল্লাহ বিন সালমান লিখেন–

هذه النظرية ترى ان الاوراق النقدية كالفلوس فى طروالثمنية عليها فماثبت للفلوس من احكام الربا والزكاة والسلم تثبت للاوراق النقدية مثلها وقد قال بهذه النظرية مجموعة كبيرة من افاضل العلماء ويعتبر القائل بها فى الجملة وسطا بين القائلين بالنظرية السندية والقائلين بالنظرية العرضية ، ولا شك انه اقرب الاقوال الى الاصابة فى نظرنا- (النقد الورقى ٨٣)

অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম হলো এই যে, ব্যাংক নোট প্রচলিত ছমন হওয়ার মধ্যে পয়সার মতো। তাই সুদ, যাকাত, ছলম ইত্যাদির যে সমস্ত বিধান পয়সার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা ব্যাংক নোটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের এক দলের। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্য দুই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ ব্যাংক নোট ঋণের সার্টিফিকেট, ব্যাংক নোট পণ্যের অন্তর্ভুক্ত এর তুলনায় স্বতন্ত্র ও মধ্যমীয়। এবং নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার মতে হক এবং যথার্থতার অতীব কাছাকাছি।

শায়খ আহমদ খতীব এ বিষয়ে লিখেন–

فتبين بجميع ذلك ان النوت كالفلوس النحاسية فى جميع احكامها ظاهرا وباطنا (اقناع النفوس بالحاق النوت بالفلوس ٤٨)

অর্থাৎ উপর্যুক্ত দলিল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে, ব্যাংক নোট প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ভাবেই সব বিধানের ক্ষেত্রে তাম্র দ্বারা তৈরি পয়সার মতো।

প্রাধান্য :

আমাদের পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে যেহেতু ব্যাংক নোটবিষয়ক ফিকহবিদদের মতামত চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ মতামতের প্রাধান্যতা প্রমাণ করেছি। তাই এ পর্যায়েও প্রাধান্য হলো যে, ব্যাংক নোটের লেনদেন বাঈ ছরফ নয়।

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে স্বদেশীয় মুদ্রার লেনদেন :

আমরা সবাই অবগত যে, এক দেশের সব মুদ্রা সমজাতীয় এবং ভিনদেশীয় মুদ্রা ভিন্নজাতীয়। মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রাপ্ত মত হলো, ব্যাংক নোট বা প্রচলিত মুদ্রা, পয়সার বিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং পয়সার বিষয়ে ইসলামী ফিকহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য প্রসিদ্ধ। যা সবিস্তারে পূর্বের সংখ্যাগুলোর মধ্যে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) পয়সার লেনদেনে অতিরিক্ততাকে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছেন। বরং অনির্ধারিত হলে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত ও তাঁদের মত। তাই উক্ত মতানুসারে দেশীয় মুদ্রার লেনদেনেও কম-বেশ করা বৈধ হবে না এবং অতিরিক্ততা অবৈধ হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে পয়সার আলোচনা অধ্যায়ে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো, পয়সা সমমূল্যমানের হওয়া। তাই বেচা-বিক্রির সময় যদি বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে একটা অপরটার তুলনায় বেশি হয় তাহলে শর্ত সাপেক্ষীয় ওই অতিরিক্ততা বিনিময় শূন্য হবে, যা সুদ এবং সুদ হারাম।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের নিকট ব্যাংক নোট ঋণের সার্টিফিকেট, তাদের মতে ব্যাংক নোটের লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে অবৈধ। বরং হাওয়ালার পদ্ধতিতে বৈধ এবং যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের নিকট ব্যাংক নোট সাধারণ পণ্য বা Goods এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মতে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ই শুধু বৈধ নয়। বরং এতে অতিরিক্ততাও বৈধ। যে সমস্ত ওলামায়ে কেরামের নিকট ব্যাংক নোট স্বর্ণ-রৌপ্যের বিকল্প বা Substitute এবং এর স্থলাভিষিক্ত তাদের মতে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় সমতার ভিত্তিতে জায়েয ও বৈধ এবং তা হবে বাঈ ছরফ।

ব্যাংক নোট ও প্রচলিত মুদ্রার বিষয়ে আরো একটি নতুন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি :

হযরত আল্লামা মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (রহ.)-এর মতে, এক টাকার নোট পয়সার হুকুমের মধ্যে এবং অন্যান্য বড় নোট এক টাকার নোট ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রার সার্টিফিকেটও রসিদ। এর ব্যাখ্যায় তিনি যৌক্তিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে দেশীয় আমদানি-রপ্তানির হিসেবে সর্বমোট উৎপাদনের সমান ধাতব মুদ্রা এবং এক টাকার নোট ইস্যু করা হয়। অতঃপর ওই সব ধাতব মুদ্রা এবং এক টাকার নোটগুলোর সর্বমোট হিসাব মতে এর সার্টিফিকেটস্বরূপ বড় নোট ইস্যু করা হয়ে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উক্ত বর্ণনা মতে। ধাতব মুদ্রা সমান পয়সা। এক টাকার নোট পয়সার হুকুমের মধ্যে। বড় নোট পয়সার সার্টিফিকেট। তাই উদাহরণস্বরূপ দশ টাকার নোট দশটা এক টাকার নোট বা এর সমান ধাতব মুদ্রার সার্টিফিকেট অর্থাৎ দশ টাকার নোট স্বয়ং মুদ্রা বা মাল নয়। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মুফতী সাহেব (রহ.) দেশীয় মুদ্রার লেনদেন বিষয়ে লিখেন–

ایک روپے کے نوٹ بحکم فلوس ہیں، اس لئے ان کا باہم مبادلہ جائز ہے، البتہ تفاضل اور نسا حرام ہے، اگر کہیں نساء کی ضرورت پیش آئے، تو مبادلے کی بجائے استقراض کا معاملہ کیا جاسکتا ہے، بڑے نوٹوں کے عوض ایک روپے کے نوٹ لینا اس معاملے کو استقراض میں داخل کیا جا سکتا ہے، بڑے نوٹوں کا باہم مبادلہ یہ درحقیقت مال کا مال کا مبادلہ نہیں، بلکہ رسید کا رسید سے ہے، اس لئے جائز ہے۔ (احسن الفتاوی ۷/۸۲، ۹۲)

অর্থাৎ এক টাকার নোট পয়সার হুকুমের মধ্যে। তাই ওইগুলোকে পরস্পর লেনদেন করা বৈধ হবে। তবে অতিরিক্ততা ও বাকিতে লেনদেন করা হারাম হবে। কখনো যদি বাকিতে লেনদেন করার অতীব প্রয়োজন পড়ে তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিবর্তে ঋণের মুয়ামালা করা যেতে পারে। বড় নোটের পরিবর্তে এক টাকার নোট গ্রহণ করাকে ঋণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বড় নোটকে বড় নোটের সাথে হাত বদল করা বাস্তবে মালকে মালের বিনিময়ে লেনদেন নয়। বরং সার্টিফিকেটের সাথে সার্টিফিকেটের বিনিময়। তাই উক্ত মুয়ামালা Transection শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেশীয় মুদ্রাবিষয়ক চারটি পদ্ধতি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়। (ক) এক টাকার নোটকে এক টাকার নোটের সাথে লেনদেন দুটি শর্তের ভিত্তিতে বৈধ। (১) বিনিময়দ্বয়ের মধ্যে সমতা। (২) তাৎক্ষণিক বিনিময়দ্বয়ের ওপর কবজ করা। (খ) ওইগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বাকিতে বৈধ হবে না। তবে ঋণের ভিত্তিতে বৈধ হবে। যথা রহিম, করিমকে আজকের তারিখে এক টাকার একশ'টা নোট ঋণ হিসেবে প্রদান করল এবং এক মাস পরে করিম তা রহিমকে রিটার্ন করল। (গ) একশ টাকার একটা নোট এক টাকার একশটা নোটের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। তাই এতে ঋণের হীলা করা যেতে পারে। (ঘ) একশ টাকার নোটকে একশ টাকার নোটের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

পর্যালোচনা :

ব্যাংক নোট বিষয়ে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর উপরোক্ত অবস্থানের ভিত্তি হলো, এই বক্তব্যের ওপর যে, দেশে এক টাকার যত নোট থাকে এর সমপরিমাণ সার্টিফিকেট হিসেবে বড় নোট ইস্যু করা হয়। অথচ তা যথার্থ নয়। কেননা তথ্য-উপাত্ত ও চাক্ষুষ প্রমাণ হলো যে, দেশে বড় নোট এক টাকার নোটের তুলনায় অনেক গুণ বেশি বাজারে প্রচলিত থাকে। তাই উক্ত অবস্থান বা মতের মূল ভিত্তিই ঠিক না। এবং ব্যাংক নোটের বিষয়ে আমরা

ফুকাহায়ে কেরামের মত চতুষ্টয়ের মধ্যে চতুর্থ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যেসব দলিল, প্রমাণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করেছি তা দ্বারাও এই মতটার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। তাই ব্যাংক নোট বিষয়ে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা প্রমাণ করে এর ওপর ভিত্তি করে বর্ণনাকৃত মাসায়িলগুলোর অসারতাও। পাশাপাশি উপরে উল্লিখিত চার পদ্ধতির চতুর্থ পদ্ধতি, অর্থাৎ বড় নোটকে বড় নোটের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা দেওয়া এটাও ঠিক নয়। কেননা উক্ত পদ্ধতি بيع الكالئ بالكالئ বা ঋণের বিনিময়ে ঋণের লেনদেন হয়। তার কারণ এই যে, বড় নোট যেহেতু তার মতে মাল নয়। বরং মালের সার্টিফিকেট বা রসিদ মাত্র। পক্ষান্তরে রসিদের ওপর কবজ করা মালের ওপর কবজ করা নয়। তাই উক্ত লেনদেনে কোনো একপক্ষ থেকেও মালের ওপর কবজ পাওয়া যায়নি। বিধায় উক্ত পদ্ধতির লেনদেনকে ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বৈধ বলার কোনো উপায় নেই। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের ওলামায়ে কেরাম যখন Bank note কে ঋণের সার্টিফিকেট সাব্যস্ত করেন তখন তাঁরা এর লেনদেন ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে অবৈধ বলেছেন। তবে উক্ত লেনদেনকে হাওয়ালায় রূপান্তরিত করে বৈধতা দিয়েছেন। তাই মুফতী সাহেব এর উক্ত মতও এর ওপর ভিত্তি করা মাসায়িল দুর্বল।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপটিক্যাল কোং

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারি ও খুচরা দেশি-বিদেশি চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "লা-মাযহাবী ফিতনা প্রতিরোধে উলামায়ে কেরামের করণীয়" শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত সায়্যিদ মুফতী মাসূম সাক্বিব ফয়জাবাদী কাসেমী সাহেবের যুগান্তকারী তাকরীর

লা-মাযহাবী ফিতনা : বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়-১০

লা-মাযহাবীদের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতবিরোধপূর্ণ মাস'আলার একটি নির্ঘণ্ট :

এখানে যে তালিকা উপস্থাপন করা হবে, তা লা-মাযহাবীদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত গ্রন্থ থেকেই নেয়া হয়েছে। তাদের সাথে মূল মতবিরোধপূর্ণ মাস'আলাগুলো নিয়ে আমি একটি ছোট পুস্তিকা সংকলন করেছি। পুস্তিকাটি আমি এই মারকাযে রেখে যাব। যাঁদের ইচ্ছা, তাঁরা নিতে পারেন। এই পুস্তিকায় আমি ৩৬টি মাস'আলা সংকলন করেছি। যেসব গ্রন্থ থেকে আমি তাদের মতামত উল্লেখ করেছি, তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি। (১) আরফুল জাদী। (২) জামেউশ মাওয়াহিদ (৩) কানযুল হাকায়েক (৪) পারছায়ে আহলে হাদীস (৫) ফিকহে মুহাম্মদী (৬) ফাতাওয়া ছুনাইয়্যাহ (৭) ফাতাওয়া নজিরীয়্যাহ (৮) বুদুরুল আহিল্লা (৯) মুহাম্মদী নামায (১০) ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদীস (১১) হাদিয়াতুল মাহদী (১২) লুগাতুল হাদীস (১৩) শাময়ে মুহাম্মদী (১৪) খোতবাতে ইসহাক (১৫) তানভীরুল আফাক ফী মাসআলাতিত তালাক (১৬) ফাতাওয়া সলফিয়্যাহ প্রভৃতি।

আমি সামনে কিছু মাস'আলা উপস্থাপন করছি। যা দেখে আপনারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, চার মাযহাবের উদ্ভব এটা ইসলাম ধর্মে ফেরকাবাজি কিংবা গ্রুপিং কস্মিনকালেও নয়, বরং যুগশ্রেষ্ঠ পূর্বসূরিদের আলোকিত রাস্তা ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে মূলত লা-মাযহাবীরাই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য আর বিভেদের মহাপ্রাচীর দাঁড় করানোর অপপ্রয়াসে ব্যাপৃত। তাদের সৃষ্ট অনৈক্যের প্রতি ইসলাম ধর্মে কঠোর হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাদের প্রতিরোধ করা হকপন্থী সকল মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। এ গুরুদায়িত্ব পালনেই এগিয়ে এসেছেন উপমহাদেশের সর্বজনস্বীকৃত বর্ষীয়ান মুরুব্বি, যুগের শ্রেষ্ঠ আলোকিত সন্তান হযরত ওয়ালা ফকীহুল মিল্লাত দা. বা.। আল্লাহ হযরতের পবিত্র ছায়াকে আমাদের ওপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

সম্মানিত সুধীসমাজ! লা-মাযহাবীদের সাথে আমাদের যে মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ, তার একটি নির্ঘণ্ট নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। খুব গুরুত্বের সাথে শোনার চেষ্টা করি।

(১) চার মাযহাবসহ বিশ্বের স্বীকৃত সব আলেমের মতামত হচ্ছে, শরীয়তের মূল ভিত্তি চারটি বিষয়ের ওপর। ১. কুরআন শরীফ। ২. হাদীসে রাসূল (সা.)। ৩. ইজমা (উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত)। ৪. কিয়াস (কোনো বিধানকে মূল থেকে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করা)। সব যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এই চারটি বিষয়কেই শরীয়তের মূল ভিত হিসেবে মানেন। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ইমামের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়নি। উম্মাহর সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তের সর্বপ্রথম বিরোধিতা করে লা-মাযহাবীরা। তাদের অবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার মুখে মুখে যে কথাটি অহর্নিশি উচ্চারিত হয়, তা হলো, শরীয়তের মূলনীতি দুটি। ১. কিতাবুল্লাহ। ২. হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.)। এ ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি এত চরম পর্যায়ে যে, তারা সুন্নাতকে পর্যন্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। অথচ আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্দেশ্য সুন্নাতের ওপর আমল করা, হাদীসের ওপর আমল করা নয়। আর মানবজীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সব বিষয় পবিত্র কুরআনে-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে বলে দাবি করাটা পাগলের প্রলাপ বৈ কিছু নয়। এ বিষয়ে কিছুটা বিশদ বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতিক্রমে চার ইমামের কোনো ইমামের তাকলীদকে জায়েয এবং অনেকেই ওয়াজিব লিগাইরিহী বলেছেন। উম্মাহর ধারাবাহিক কর্মপরম্পরাও এর পক্ষেই প্রমাণ বহন করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকলীদ করতে হয়, ইসলাম ধর্মে কতভাগ মাস'আলা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে আর কতভাগ মাস'আলায় তাকলীদ করার প্রয়োজন হয়, সেসব বিষয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাই এর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু লা-মাযহাবীরা তাকলীদকে সর্বতোভাবে শিরক আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের ভাষ্য মতে, গুটিকতেক লা-মাযহাবী ছাড়া (যাদের সঠিক পরিসংখ্যান নিলে হাজারের গণ্ডি পেরোয় কিনা সন্দেহ) পৃথিবীর তাবৎ মাযহাবপন্থীরা মুশরিক।

(৩) ওয়াসীলা ধরা : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয। এর জন্য কিতাবে স্বতন্ত্র ওয়াসীলার দু'আ রয়েছে। তবে তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী লা-মাযহাবীদের ভাষ্য মতে, দু'আয় ওয়াসীলা ধরা সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং শিরক।

(৪) ঈসালে সওয়াব : একজনের

আমলের সওয়াব অপরকে পৌঁছানো, পৃথিবীর তাবৎ হকপন্থীরা এর প্রবক্তা। এখানেও লা-মাযহাবীদের সেই একই মত! ঈসালে সওয়াব হারাম এবং বিদ'আত।

(৫) মহিলা আর পুরুষের নামাযে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এ ব্যাপারে পূর্বের সমস্ত আলেম একমত যে, মহিলা-পুরুষের নামাযে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবধান রয়েছে। পুরুষ সাহাবী আর মহিলা সাহাবীর নামাযে বিস্তর ব্যবধানের কথা আমরা হাদীসের কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে পাই। কিন্তু লা-মাযহাবীরা যেন পণ করে বসেছে, তারা যা বলবে, আমরা সম্পূর্ণ তার বিরুদ্ধে বলব। তাই লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, মহিলা-পুরুষের নামাযে কোনো ব্যবধান নেই। মহিলারা হুবহু পুরুষের মতোই নামায পড়বে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কোনো মহিলা কি আজ পর্যন্ত আযান দিয়েছে? ইকামত দিয়েছে? নামাযের ইমামতি করেছে? এত মোটা মোটা কথাও যাদের মাথায় আসে না, তাদের মাথায় আর যাই আসুক, শরীয়তের মাস'আলা আসার কথা না। মহিলারা যখন আযান-ইকামত দিতে পারে না, ইমামতি করতে পারে না, খোতবা দিতে পারে না, পুরুষ-মহিলার নামাযে পার্থক্য হলো কি না? আপনারাই বলুন!

(৬) নামায আদায় করতে মহিলাদের জন্য মসজিদে গমন করা মাকরূহে তাহরীমি তথা হারামের নিকটবর্তী। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, মহিলারা নামায পড়তে মসজিদে যাবে। লা-মাযহাবীরা সব ক্ষেত্রে ইমাম বোখারী, ইমাম বোখারী বলে মায়াকান্না করলেও এখানে তারা ইমাম বোখারীর মতামতকে সর্বোতভাবে অগ্রাহ্য করেছে। কারণ ইমাম বোখারী (রহ.)-এর মতামত হচ্ছে, মহিলারা নামাযের জন্য মসজিদে গমন করবে না। আপনারা বোখারী শরীফ খুলে দেখুন! সেখানে ইমাম বোখারী (রহ.) বলেন–

المرأة تستأذن لخروجها الى المسجد

"মহিলারা মসজিদপানে গমন করতে স্বামীর অনুমতি নেবে।" এভাবে শিরোনাম করেছেন। শায়খুল হাদীস মাওলানা ইউনুস দা. বা. বলেন, অনুমতি নিতে হয় ওই বিষয়ের জন্য, যেখানে নিষেধাজ্ঞার খড়্গ থাকে। মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই। তাই ইমাম বোখারী (রহ.) এই শিরোনামে বাব (পরিচ্ছদ) রচনা করেছেন। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সে যদি মসজিদে যেতে আদিষ্ট হয়, তাহলে তার স্বামীর অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ফিকহুল বোখারীও এটাই। আমি লা-মাযহাবীদেরকে বলি, আপনারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, রাসূল (সা.) -এর সোনালি যুগে মহিলারা নামায পড়তে যেত। ঠিক আছে। কিন্তু ভাই, সে যুগে মহিলাদের জন্য তো কোনো স্বতন্ত্র মসজিদ তৈরি করা হতো না। আর আপনারা তো মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর তৈরি করছেন। ভাই! দাবি প্রমাণ করতে চাইলে শুধু এক অংশ প্রমাণ করবেন, আর এক অংশ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করবেন, তা তো বিদ্বানদের স্বভাব না। বরং তা সুবিধাবাদেরই পরিচায়ক বটে। শুধু নামাযের জন্য আসাটা প্রমাণ করতে কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! কিন্তু তাদের জন্য আলাদা ঘর করা, আলাদা অজুখানা, আলাদা টয়লেট, এগুলোর অনুমতি কোথায় পেলেন? বাস্তব কথা হচ্ছে, সে যুগের মহিলা সাহাবীরা মসজিদে অধিক সওয়াবের আশায় নামায পড়তে আসতেন না, বরং রাসূল (সা.)-এর যিয়ারত এবং দর্শনটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। রাসূল (সা.)-এর কাছে তাঁরা মাস'আলাও জিজ্ঞেস করতেন। এ কারণেই তাঁরা মসজিদে আসতেন। রাসূল (সা.) সালাম ফিরানোর পর সর্বপ্রথম মহিলারা মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতেন। অতঃপর পুরুষরা মসজিদ থেকে বের হতেন। সোনালি যুগ হওয়া সত্ত্বেও কত কঠিন শর্ত পূরণ করে মহিলারা রাসূলের যুগে মসজিদে আসতেন তা একটু স্মরণ করুন। রাসূল (সা.)-এর পর ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মহিলাদের জন্য মসজিদে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। রাসূল (সা.)-এর পবিত্র যুগেও মহিলারা প্রত্যেক মসজিদে নামায পড়তে জড়ো হতেন না। শুধুমাত্র মসজিদে নববীতেই তাঁরা জড়ো হতেন।

(৭) মহিলারা ঈদের নামায এবং জুম'আর নামায পড়তে মসজিদে যাবে না। এটাই উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, তাদেরকে মসজিদে যেতে হবে।

(৮) ইসলাম ধর্মের বিধান হচ্ছে, মহিলারা সর্বাবস্থায় পর্দা করবে। পর্দা করা মহিলাদের জন্য ফরয। কোনো অবস্থায় তা রহিত হয় না। তবে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, সাধারণ মহিলাদের ওপর পর্দার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং পর্দার বিধান বিশেষ মহিলাদের জন্য।

(৯) শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হচ্ছে, এক ব্যক্তির জন্য একই সাথে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হারাম। কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে, একই সাথে দশজন স্ত্রী রাখা যাবে। (উরফুল জাদী-১১৫)

(১০) কেউ যদি এহরাম অবস্থায় আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে তার হজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, এহরাম অবস্থায় সহবাস করলে তার হজ বিনষ্ট হবে না।

(১১) নামাযের সময় আপন লজ্জা স্থান

ঢাকা ফরয। তথা নামাযের বিশেষ শর্ত। এখন কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সতর না ঢেকে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায হবে না। কিন্তু লা-মাযহাবীরা বলছে, মহিলারা যদি সতর না ঢেকেও নামায আদায় করে, তবুও তার নামায বিনষ্ট হবে না।

(১২) যার ওপর গোসল ফরয এবং ঋতুস্রাব অবস্থায় মহিলার জন্য পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু লা-মাযহাবীরা তাদের জন্য পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সম্পূর্ণভাবে বৈধ বলে। (দলিলুত তালেব-২৫)

(১৩) চার ইমামের মতে, নামাযের জায়গা এবং মুসল্লির কাপড় পবিত্র হওয়া নামাযের অন্যতম শর্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীদের কাছে তা শর্ত নয়।

(১৪) আমাদের মতে, নামাযের জন্য যেসব কন্ডিশন প্রযোজ্য, সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্যও একই কন্ডিশন প্রযোজ্য। অপবিত্র এবং অযুবিহীন সিজদায়ে তেলাওয়াত করা যাবে না। লা-মাযহাবীদের মতে অযুবিহীন সিজদায়ে তেলাওয়াত করা জায়েয। (বুদুরুল আহিল্লা-৬৮)

(১৫) আমাদের মতে, কোনো ব্যক্তির ওপর মুসাফিরের বিধান (যথা চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায দু'রাকআত পড়া, ফরয রোযা পরবর্তিতে রাখার সুবিধা, প্রভৃতি) প্রযোজ্য হওয়ার জন্য তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্রমণ করতে হবে। অন্যথায় সে মুসাফির হিসেবে পরিগণিত হবে না। কিন্তু লা-মাযহাবীদের কাছে তার কোনো সীমা নেই।

(১৬) কোনো ব্যক্তির নামায ছুটে গেলে পরবর্তীতে তার কাযা করে দিতে হয়। এটা উম্মাহর সর্বস্বীকৃত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, শরীয়তে কাযার কোনো বিধান নেই। কেউ ঠিকমতো নামায না পড়লে তার কোনো কাযা নেই। পড়লেও কোনো লাভ নেই। ওমরী কাযা তাদের মতে সম্পূর্ণ বিদ'আত। (দলিলুত তালিব-২৫০)

তাদের এই অযৌক্তিক কথার প্রত্যুত্তরে আমি বলি, নামায বান্দার ওপর মহান আল্লাহর পাওনা। তা যথাসময়ে পরিশোধ না করলে একেবারে পরিশোধ করতে হবে না! এমন উদ্ভট কথা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে অতি প্রগতিশীলতা এবং আধুনিকতার ধোঁয়া তুলে নতুন নতুন অশ্রুতপূর্ণ কথার সংযোজন-বিয়োজনকে নিজেদের 'মহান ক্রেডিট' হিসেবে প্রচার করে আত্মপ্রসাদে ভোগেন। ধরুন, আপনি ছলিমের কাছ থেকে আজ একশ টাকা ঋণ নিলেন, কিন্তু আপনি এর পূর্বে রহিমের কাছে একশ টাকার ঋণী। এখন আপনি যদি বলেন, পুরাতন ঋণ পরিশোধ করার দায় আমার ওপর বর্তায় না। তাই আমি তা পরিশোধ করব না। এ ধরনের গাঁজাখুরি মন্তব্যকারীর জন্য পাগলা গারদই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। তাই কাযাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি কোনো ব্যক্তির ওপর যদি কাযা নামায রয়ে যায়, তাহলে মৃত্যুর সময় তার ফিদিয়া আদায় করার জন্য ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যেতে হবে। আর রোযার ওপর অনুমান করে আমাদের সলফে সালেহীনরা নামাযের ফিদিয়াও নির্ধারণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেছেন– سيجزيه ان شاء الله

আল্লাহ চাইলে, নামাযের জন্যও রোযার অনুরূপ ফিদিয়া যথেষ্ট হয়ে যাবে।

(১৭) সমস্ত ইমামের মতে, জুম'আর সময় দু'আযান হবে। রাসূল (সা.)-এর মুবারক যুগে শুধুমাত্র ইমামের সম্মুখে খোতবার পূর্বে আযান হতো। কিন্তু ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.) জুম'আর নামাযের পূর্বে আরেকটি আযানের প্রবর্তন করেছেন। ইমামের সম্মুখে আযানকে পূর্বের মতই বহাল রাখলেন। লা-মাযহাবীদের স্পর্ধা, প্রগলভতা আর অহংবোধের নমুনা দেখুন! তারা হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত প্রথম আযানকে বিদ'আত আখ্যা দেয়। তাদের ভাষ্য মতে, জুম'আর প্রথম আযান বিদ'আতে উসমানী, যেমন তারাবীর নামায বিশ রাক'আত পড়াটা বিদ'আতে ওমরী। অথচ হযরত উসমান (রা.) এর মুবারক যুগ থেকে অদ্যাবধি কেউ এই দু'আযানের বিরোধিতা করেনি।

(১৮) জুমাবারে যদি ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহা হয়, তাহলে যোহরের সময় জুম'আর নামায আদায় করবে। ইশরাকের সময় ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার নামায আদায় করবে। এটাই পুরো উম্মতের সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত। চার মাযহাবের মান্যবর ইমামসহ প্রায় সব ইসলামী গবেষক এই মতের প্রবক্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীদের মত হচ্ছে, জু'মআর দিন ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহা সংঘটিত হয়, তাহলে ঐদিন জুম'আর নামায মাফ হয়ে যাবে। তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দেখে বাস্তব অর্থেই করুণা হয়। দিবাকরের মতো প্রতিভাত একটা কথা বুঝে না আসার কারণ আমি বুঝি না। কোথায় ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামায আর কোথায় জুম'আর নামায! নিজেদেরকে আহলে হাদীস পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগে, কিন্তু শত আফসোস! হাদীস থেকে তাদের অবস্থান কত যোজন-যোজন দূরে। তারা কি দেখে না সেই হাদীস, যে হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদের নামায এবং জুম'আর নামায উভয়টা আদায়

করেছেন। আসল কথা হচ্ছে, কেউ যদি না ঘুমিয়ে ঘুমের ভান করে, তাকে জাগানোটা কষ্টকরই নয়, অসম্ভবই বটে।

(১৯) স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দেওয়া। চার মাযহাবের কারো এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, এক মজলিসে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

কিছুক্ষণ পূর্বে আমার অত্যন্ত সুহৃদ মাওলানা আহমদুল্লাহর ঘটনা বলেছিলাম, তিনি আমাদেরকে একটি চমকপ্রদ ঘটনা শুনিয়েছেন। তাঁর এক প্রতিবেশী ছিল লা-মাযহাবী। তার বিশাল এক রেস্তোরাঁ ছিল, সকালে রুটি-ভাজিসহ ভালো ভালো নাস্তা পাওয়া যেত তার দোকানে। একদিন প্রত্যুষে এক ব্যক্তি তিন প্লেট ভাজি সাবাড় করে। কিন্তু যাওয়ার সময় সে মাত্র এক প্লেট ভাজির দাম দিতে চাইল। ওই লা-মাযহাবী ম্যানেজার রাগে গজ গজ করতে করতে বলল, আপনাকে দেখতে তো সজ্জন ব্যক্তি মনে হয়। বয়োবৃদ্ধ হয়েছেন, তাই মনে হয় ভীমরতি ধরেছে। অসুরের মতো একাই তিন প্লেট সাবাড় করলেন, কিন্তু দাম দিচ্ছেন এক প্লেটের! এজন্য তো মাযহাবীদের (অবশ্যই সে বলেছে, মুশরিকদের) কাছ থেকে আমরা নিরাপদ দূরত্ব অবলম্বন করি। ওই ব্যক্তির জ্ঞানগর্ভ উত্তরটিই আমার মূল বিষয়। সে স্মিত হেসে বলল, এত রাগারাগির কী আছে? যেহেতু এক বৈঠকে তিন প্লেট ভাজি খেয়েছি, তাহলে এক প্লেটের দাম দিলেই তো হচ্ছে, কারণ আপনাদের মতে, এক বৈঠকে তিনকে এক হিসেবেই গণ্য করা হয়। ওই লা-মাযহাবীর জন্য তখন মুখব্যাদান করে বসে থাকা ছাড়া আর কী বা করার আছে?

লা-মাযহাবী এক মাওলানার করুণ অবস্থা

এ সম্পর্কে আরেকটি চমৎকার ঘটনা শোনাচ্ছি। হিন্দুস্তানে লা-মাযহাবীদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকার তাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করে। তেমনই এক প্রতিষ্ঠানের দারোয়ান ওই প্রতিষ্ঠানে হেড মাওলানাকে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তিখেউড় করে। দারোয়ান ছিল গ্রাম্য লোক। তার গালমন্দ শুনে যেকোনো ভব্য মানুষের পক্ষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাই ওই হেড মাওলানা দারোয়ানের বিপক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর কাছে কঠোর ভাষায় নালিশ দায়ের করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যেহেতু সরকারি, তাই কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার স্বাধীনতা শুধুমাত্র সরকারের। প্রধান নির্বাহী সে জন্য সুপারিশ করতে পারবেন মাত্র। তিনি হেড মাওলানাকে বললেন, আপনার অভিযোগের পক্ষে কেউ সাক্ষী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমাদের মক্তবের মাস্টার সাহেব তা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেছেন। কিন্তু বিধি বাম, মাস্টার সাহেব ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আধ ঘণ্টা পর্যন্ত দারোয়ান অকথ্য ভাষায় যে গালাগাল করেছে, তা আমি শুনলেও সাক্ষ্য দিতে পারব মাত্র একটি গালির। কারণ, আধ ঘণ্টা ধরে গালি দিলেও সে কিন্তু এক জায়গাতেই ছিল। সুতরাং পুরো বৈঠকের গালিকেই একটি গালি হিসেবে গণ্য করা হবে। মাস্টার সাহেবের কথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হলো। হেড মাওলানা কোথায় দারোয়ানের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন! উপরন্তু তাদের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি! আমি বলি, ছোট্ট শিশুও তিনকে তিন বলে, কিন্তু লা-মাযহাবীদের ইলমী দৈন্যতা এবং নিঃস্বতা দেখুন, তারা তিনকে এক বলে। আমি রসিকতা করে বলি, তিন তালাক দিলে যদি এক তালাক পতিত হয়, তাহলে নয় তালাক দিলে তো কমপক্ষে তিন তালাক পতিত হওয়ার কথা! ইসলামের সোনালি যুগ তথা সাহাবায়ে কেরাম (রা.), তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কেউ তিন তালাক দিলেও এক তালাক পতিত হবে, এই মতের প্রবক্তা ছিলেন না।

একটা মজার তথ্য

একবার আমাকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষ লা-মাযহাবী হয় কেন? আমি সহাস্য বদনে বললাম, অধিকাংশ লোক লা-মাযহাবী হয় হালালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। অর্থাৎ কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলে, তাহলে সব ইমামের মতে, তিন তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। তবে অন্য স্বামীর কাছে বিয়ে দেয়ার পর সে যদি তাকে তালাক দিয়ে ফেলে, তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য ওই স্ত্রী পুনরায় বৈধ হয়ে যাবে। (শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই হালালা বলা হয়।) কিন্তু লা-মাযহাবীদের মতে যেহেতু তিন তালাক দিলেও এক তালাক পতিত হয়, তাই তাদের মতে হালালারও কোনো প্রয়োজন নেই। এই পার্থিব স্বার্থের খাতিরেই অধিকাংশ লোক লা-মাযহাবী হয়ে থাকে। তাই লা-মাযহাবীরা অনুক্ষণ দ্বীনের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে নিজেদের ধান্ধায় ব্যতিব্যস্ত থাকে।

(২০) পূর্ববর্তী সকল ইমামের মতে, সাহাবীদের আছার তথা তাদের বক্তব্য দ্বীনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু লা-মাযহাবীরা সাহাবীদের বক্তব্যকে অগ্রহণযোগ্য মনে করে।

(২১) হায়াতুন নবী তথা নবী করীম (সা.) আলমে বরযখে স্বীয় রওজা মুবারকে স্বশরীরে জীবিত আছেন। তাই তো কোনো উম্মত দূর থেকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করলে, সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা

রাসূল (সা.)-এর নিকট পৌঁছানো হয় এবং তিনি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। আর কেউ রওজা মুবারকের নিকট এসে সালাত ও সালাম পাঠ করলে, তা রাসূল (সা.) সরাসরি গ্রহণ করেন। তাই রাসূল (সা.)-এর কবরের হায়াত এবং সাধারণ মুসলমানদের কবরের হায়াতে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। হায়াতুন নবী (সা.)-এর আকীদা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত। অথচ লা-মাযহাবীদের আকীদা হচ্ছে, কবরে সাধারণ মুসলমানের অবস্থা আর নবী করীম (সা.)-এর অবস্থার মাঝে তেমন কোনো তফাত নেই। অর্থাৎ উভয়েই মৃত।

হায়াতুন নবী (সা.) সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে দুয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি।

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ الانبياء احياء فى قبورهم-

"হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম স্বীয়-স্বীয় রওজা মুবারকে জীবিত আছেন। (বায়হাকী, মুসনাদে আবু ইয়ালা-৬/৩৪২৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১৩৮১২)

লা-মাযহাবীদের প্রধান গুরুজন আলবানীও হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে মতামত দিয়েছেন। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ ২/১৮৭, হা. ৬২১।

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال مامن احد يسلم على الا رد على روحى حتى ارد عليه السلام

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, যে কেউ আমার ওপর সালাম পাঠ করে, তা আমাকে পৌঁছানো হয়। এবং আমি তার উত্তর প্রদান করি। (আবু দাউদ ৪/২০৩৬)

এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসের খ্যাতিমান ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহ.) বলেন–

رواه ابوداود باسناد صحيح

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। (রিয়াদুস সালেহীন ১/২৫৫, হা.১৪০২)

লা-মাযহাবীদের আরেক মান্যবর ইমাম কাজী শওকানী হাদীসটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন–

واصح ما ورد فى ذلك مارواه احمد وابوداود عن ابى هريرة

হায়াতুন নবী (সা.) সম্পর্কে এই হাদীসটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। (নাইলুল আওতার ৫/১৬৪)

(এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, সূরা আয যুমার-২৯-৩০, সূরা আল বাকারা-১৫৪, ফতহুল বারী ৬/৩৭৯, সহীহ মুসলিম ৩০/৫৮৫৮, সুনানে ইবনে মাজাহ ১/১৬২৬, তাবারানী ১২/৪০৬, শুআবুল ঈমান ৩/৪৮৯)

(২২) নবী করীম (সা.)-এর কবর মুবারক যিয়ারত করা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয়। অনেকেই বলতে পারেন, নজদের আলেমরা তা নিষেধ করে থাকে। আসলে এটা তাদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বাড়াবাড়ি এবং মাত্রাতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন। কারণ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হচ্ছে, রওজা মুবারক যিয়ারত করার নিমিত্তে মদীনা শরীফ সফর করা শরীয়তের আলোকে কেবল বৈধই নয়, বরং পছন্দনীয়। শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) তাঁর অনবদ্য জগৎখ্যাত গ্রন্থ ফাজায়েলে আমালে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর আরও কয়েকটি উক্তি এ বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, রওজা মুবারকের যিয়ারত করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। কেউ যদি সে উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ সফর করে, সে কট্টর বিদ'আতী। (নাউযুবিল্লাহ) (উরফুল জাদী-২৫৭)

(২৩) মহান আল্লাহ হাজির-নাজির তথা-সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং শক্তি জগতের সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

والله معكم اينما كنتم

এর ব্যাখ্যায় হকপন্থী আলেমদের মত হচ্ছে, اى بالعلم والاحاطة والقدرة অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান এবং শক্তির করায়ত্তে মাখলুকাতের সব। কিন্তু লা-মাযহাবীদের ভাষ্য হচ্ছে, আল্লাহ হাজির-নাজির নয়। বরং তাঁর অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তাঁর অবস্থান আরশে আজীমে। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন।

(২৪) ঝাড়-ফুঁক করা তথা কুরআনের কিছু অংশ পড়ে, কারো ওপর দম করা, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেঈনদের থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত। লা-মাযহাবীরা ঝাড়-ফুঁক করাকে শিরক আখ্যায়িত করে থাকে।

লা-মাযহাবীদের দ্বিমুখী সাংঘর্ষিক নীতির একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ

লা-মাযহাবীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন নবাব সিদ্দিক হাসান খান 'কিতাবুত তাবীযাত' নামে ঝাড়-ফুঁকসংক্রান্ত একটা ঢাউস গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সেখানে এমন এমন অনেক অশ্রুতপূর্ণ ঝাড়-ফুঁকের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আমাদের কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। লা-মাযহাবীদের কাছে এ গ্রন্থের অনবদ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত এবং অচিন্তনীয়। একদিকে ঝাড়-ফুঁক শিরক বলে বলে পুরো ধরিত্রীতে হৈচৈ ফেলে দেয়, অন্যদিকে ঝাড়-ফুঁকের গ্রন্থটিকে সম্মানের আতিশয্যে ভক্তিভরে চুমো খায়! অপরকে শিরকের মারণাস্ত্রে ঘায়েল করতে গিয়ে নিজেরা কুপোকাত হলেন কি না, বিষয়টা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

(২৫) প্রসিদ্ধ কথা, পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলি থেকে পরবর্তীরা অনেক শিক্ষা

গ্রহণ করে থাকে। তাই উপদেশ দানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলি মানুষের ওপর অবিশ্বাস্য প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু লা-মাযহাবীদের বক্তব্য হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলি পরবর্তী প্রজন্মকে কোনো শিক্ষা তো দেয় না, বরং তাদেরকে শিরকের অতল তিমিরে নিপতিত করে।

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে লা-মাযহাবীদের মাথাব্যথা

ফাজায়েলে আমাল শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলভী (রহ.)-এর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম। পবিত্র কুরআনের পর পুরো ধরিত্রীর কোণে কোণে যে গ্রন্থ সর্বাধিক পঠিত, তা হলো ফাজায়েলে আমাল। শায়খুল হাদীস (রহ.) ফাজায়েলে আমালে পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনেক আশ্চর্য ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন। যেগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় কারামত বলা হয়। লা-মাযহাবীরা এসব ঘটনার সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে, এসব অবাস্তব এবং কাল্পনিক কাহিনীমাত্র। তাই ফাজায়েলে আমাল নিয়ে লা-মাযহাবীদের অভিযোগের কোনো অন্ত নেই। আমি তাদের প্রত্যুত্তরে বলি, মু'জেযা কোনো নবীর ইচ্ছাধীন নয়, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় নবীর হাতে তা প্রকাশ পায় মাত্র। তেমনি কারামাতও কোনো ওলীর ইচ্ছাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহ চাইলে কোনো ওলীর হাতে তা প্রকাশ করেন মাত্র। সুতরাং এখানে সব কিছু হচ্ছে মহান আল্লাহর আদেশে। সুতরাং অবিশ্বাসের ধারণাই অবান্তর।

(২৬) তাসাউফ তথা এভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, যেন আমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি অন্যথায় এটা পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ইবাদত করবে যে, আল্লাহ আমাকে নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছেন। তাসাউফ হাদীসে জিবরাঈলের অংশবিশেষ। ওই হাদীসে ইহসান থেকে তাসাউফই উদ্দেশ্য। উম্মতের মাঝে তাসাউফের যে বরকতময় ধারা পরম্পরা রয়েছে, তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু লা-মাযহাবীরা তাসাউফকে সর্বোতভাবে শিরক আখ্যায়িত করে থাকে।

(২৭) যেসব পশু শরীয়তের দৃষ্টিতে খাওয়া বৈধ, তার একটি অংশ খাওয়া আমাদের মতে হারাম এবং ছয়টি অংশ মাকরূহে তাহরীমী তথা হারামের নিকটবর্তী। (১) প্রবাহিত রক্ত, যা জবাইর পর রগ থেকে সবেগে বের হয়, তা হারাম। (২) পুরুষ পশুর পুরুষ অঙ্গ। (৩) মাদী পশুর পেশাবের স্থান। (৪) অণ্ডকোষ। (৫) পেশাবের ঝুলি। (৬) পীতের থলে। (৭) গোশতের গ্রন্থি, যা অধিকাংশ সময় চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানে হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন প্রমাণ দ্বারা এগুলো খাওয়া হারাম প্রমাণিত। কিন্তু লা-মাযহাবীরা হালাল পশুর সব কিছু খাওয়া বৈধ বলে।

(২৮) আমাদের মতে, খোলাফায়ে রাশেদার আমলও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু লা-মাযহাবীরা খোলাফাদের আমলকে সুন্নাত মানতে একদম প্রস্তুত নয়, বরং তারা একধাপ এগিয়ে সেগুলোকে বিদ'আত সাব্যস্ত করে থাকে। এজন্যই তারা তারাবীর বিশ রাক'আতকে বিদ'আতে উমরী এবং জুম'আর প্রথম আযানকে বিদ'আতে উসমানী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে।

(২৯) কেউ যদি খালি মাথায় অর্থাৎ টুপিবিহীন নামায পড়ে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হয়ে গেলেও তার পদ্ধতিটি সুন্নাহ পরিপন্থী হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ পবিত্র কুরআন বলছে–

يٰبنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

"হে বনী আদম! তোমরা নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করবে।" (সূরা আরাফ)

হযরত শাহ আতাউল্লাহ (রহ.) বলতেন, তোমরা ছেঁড়া-ফাটা টুপি পরে শশুরবাড়ি যেতে সংকোচ বোধ করো, অথচ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে টুপিবিহীন যেতে একটু লজ্জা লাগে না? যে পোশাক পরিধান করে মানুষ জনসম্মুখে আসতে লজ্জাবোধ করে, সে পোশাক পরে কিভাবে আল্লাহর দরবারে যেতে পারে? কিন্তু লা-মাযহাবীরা টুপিবিহীন নামায পড়াকে সুন্নাত জ্ঞান করে থাকে। তাদের পুরোধারা এ শিরোনামে স্বতন্ত্র পুস্তক পর্যন্ত রচনা করেছেন। টুপি ইসলামের অন্যতম শিআর বা নিদর্শন। রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিরা সবযুগে টুপি পরিধান করেছেন। ইসলামের এই অন্যতম নিদর্শনকে তারা অস্বীকার করলেও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মূল পোশাক জিন্স-টাই, হেড, বোট এসব সম্পর্কে তাদের কণ্ঠ কখনো উচ্চকিত হয় না। বরং সেগুলোকে তারা দ্বিধাহীনচিত্তে পরিধান করে থাকে। বরং তাদের যত অভিযোগ, টুপির বিরুদ্ধে। ইসলামের মৌলিক নিদর্শনাবলির বিরুদ্ধে লা-মাযহাবীদের এসব ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অভিযোগ-অনুযোগ দেখে এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইংরেজদের মদদপুষ্ট এবং অর্থানুকূল্যে যে দলের গোড়াপত্তন হয়েছিল, তারা সে দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে শতভাগ না হলেও কিছু কিছু পারঙ্গমতা এবং মুনশিয়ানা দেখাতে অহর্নিশি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত রয়েছে। অন্যথায় টুপির বিরুদ্ধে তারা এত আধাজল খেয়ে নেমেছে কেন? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই তাদের বীভৎস এবং কিম্ভূতকিমাকার রূপ উম্মাহর সামনে খুব দ্রুতই প্রতিভাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির উখিয়াভী।

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের অপপ্রচার-৯

মাও. ইজহারুল ইসলাম আলকাওসারী

চার মাযহাব কি কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত?

ডা. জাকির নায়েক ইসলামে যেকোনো ধরনের মতপার্থক্যকে হারাম বলেছেন এবং এই হারাম ফেরকাবাজির মধ্যে তিনি চার মাযহাবকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং উভয় আয়াতের ক্ষেত্রে মনগড়া তাফসীর করেছেন। যেটি হারাম নয়, সেটিকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ পৃথিবীর কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াত দুটির ব্যাখ্যায় শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের মতানৈক্যকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং তাঁরা ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যের বিপরীত অর্থই প্রদান করেছেন; অথচ ডা. জাকির নায়েক একেবারে মনগড়া ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একটি হালাল ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে হারাম বলা বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াত এবং সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর Sectarian Madhabs_Groups শিরোনামের লেকচারে বলছেন,

"The answer is given in the Glorious Qur'an, in Surah Al Imran, Ch. No. 3, V. No. 103, it says ...(Arabic)... 'Hold to the rope of Allah strongly, and be not divided'. Which is the rope of Allah? The Glorious Qur'an, is the rope of Allah (swt). It says that the Muslims should hold to the rope of Allah... the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith, and they should not be divided. And the Qur'an says as I mentioned earlier, in Surah Anam, Ch. 6, V. 159, that... 'Anyone who divides the Religion into sects - you have nothing to do with him. Allah will tell him about their affairs, on the day of judgment'. That means, it is prohibited for anyone to make sects in the Religion of Islam. But when you ask, certain Muslims...'What are you?' Some say...'I am a Hanifi', some say...'I am Shafi', some say...'I am a Hambli', some say... 'I am a Maliki'. What was our beloved Prophet ? Was he Shafi ?... was he Hambli ?... Was he Maliki ?... What was he ?

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।" আল্লাহর রজ্জু কী? পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসকে আঁকড়ে ধরা উচিত এবং বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ছয় নং সূরা, আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,

"হে নবী! যে ইসলাম ধর্মে কোনো ধরনের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কী ছিলেন?

আমরা এখানে উল্লিখিত আয়াত দুটির সঠিক উদ্দেশ্য ও তাফসীর নিয়ে আলোচনা করব–

সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন,

"তোমরা সকলে 'আল্লাহর রজ্জু'কে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর তাফাররুক তথা বিভক্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

এ আয়াতে বিভক্তি বা ফেরকা সৃষ্টির যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এতে আসলে কোন ধরনের বিভক্তি উদ্দেশ্য?

ডা. জাকির নায়েক এ আয়াতে ব্যাখ্যায় ইসলামে "মুসলমান" ব্যতীত যে নামই প্রদান করা হবে, তাকেই ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তিনি বলেছেন,

See, whatever label you give, there is bound to be Tafarraqa

"মুসলমানদেরকে মুসলিম ব্যতীত অন্য যে নামই প্রদান করা হবে, তা কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _ AHL E HADITH - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lFg9 n0
ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ,)

ডা. জাকির নায়েক শুধু হানাফী, শাফেয়ী...এগুলোকেই ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি বরং তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন।

বিজ্ঞ পাঠক! এখানে আমাদের জন্য লক্ষণীয় বিষয় হলো–এ আয়াত দুটির ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ কী লিখেছেন এবং এ আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কী, ডা. জাকির নায়েক যেভাবে আয়াত দুটি দ্বারা চার মাযহাবকে হারাম ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এটি আসলে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি না। ডা. জাকির নায়েক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা পৃথিবীর কোনো মুফাসসির যদি প্রদান করতেন এবং শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্যকে হারাম বলতেন, তবে ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক কুরআনের নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য তথা মাযহাবসমূহকে হারাম বলেছেন। অথচ মুফাসসিরগণ সংশ্লিষ্ট আয়াত দুটির যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, ডা. জাকির নায়েক সম্পূর্ণ তার বিপরীত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والاغراض المختلفة، وكونوا فى دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر ،وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف فى الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معانى الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون فى أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اختلاف أمتى رحمة) وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد .

অর্থাৎ তোমরা বিভক্ত হয়ো না, এর সম্ভাব্য অর্থ হলো–তোমরা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। বরং তোমরা আল্লাহর দ্বীনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকো। সুতরাং এ আয়াতে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের এ আয়াতে ফুরূ তথা শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত অর্থে কোনো অনৈক্য নয়। কেননা প্রকৃত অনৈক্য হলো সেটিই, যার কারণে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকে না ও পারস্পরিক মিলন সম্ভব না হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য দেখা যায়, এটি মূলত শরীয়তের আবশ্যক বিধানসমূহ কুরআন ও হাদীস থেকে বের করার ক্ষেত্রে জটিলতা এবং শরীয়তের নির্দেশনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম নিত্যনতুন মাসআলার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন; অথচ তাঁরা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"আমার উম্মতের মধ্যে [মাসআলার ক্ষেত্রে] যে মতপার্থক্য তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওই অনৈক্যকে নিষিদ্ধ করেছেন, যা বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের কারণ হবে। [তাফসীরে কুরতুবী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৪]

আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর তাফসীর

আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর "আহকামুহুস সুগরা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

)(ولا تفرقوا :((يعنى فى العقائد :و قيل :لا تحاسدوا ...وقيل :المراد التخطئة فى الفروع، أى :لا يخطء أحدكم صاحبه، وليمض كل واحد على اجتهاده، فإن الكل معتصم بحبل الله، وعامل بدليله .و التفرق المنهى عنه ما أدى إلى الفتنة و التشتيت؛ وأما الاختلاف فى الفروع فهو من محاسن الشريعة، لقوله عليه السلام(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

"তোমরা বিভক্ত হয়ো না, অর্থাৎ আক্বীদার ক্ষেত্রে তোমরা বিভক্ত হয়ো না। অথবা তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা করো না। অথবা শাখাগত বিষয়ে একে অপরকে ভুল সাব্যস্ত করো না। অর্থাৎ শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে ভুল সাব্যস্ত করবে না বরং প্রত্যেকেই তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং প্রত্যেকেই দলিলের ওপর আমল করছে। আর এখানে যেই দলাদলির কথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটি হলো, সেই ফেরকাবাজি মুসলমানদের মাঝে ফেতনা এবং বিভক্তির কারণ হয়। কিন্তু শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য মূলত শরীয়তের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"কোনো ফয়সালাকারী যদি ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ ঠিক হয়, তবে সে দুটি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সে ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ ভুল হয় তবে সে এক সওয়াবের অধিকারী হবে।"

[আহকামুস সুগরা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন,

১. তোমারা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে

মতানৈক্য করো না। কেননা ধর্ম একটিই সঠিক ও সত্য। এ ছাড়া যত ধর্ম আছে, সবগুলো ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। সুতরাং যখন একটি ধর্মই সঠিক, অতএব তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অনৈক্য করো না।

২. দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পারস্পরিক শত্রুতা, বিবাদ এবং হানাহানি থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জাহেলী যুগে সদা বিবাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকত।

৩. তাদেরকে এমন বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও ভালোবাসাকে বিনষ্ট করে এবং তাদের অনৈক্যের কারণ হয়।

এ সমস্ত তাফসীর থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের ওপর মুসলিম উম্মাহের আমল মূলত কোনো বিভক্তি নয়। কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বার শত বৎসর যাবৎ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর ওপর আমল করে আসছে। সুতরাং দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ সমগ্র মুসলিম উম্মাহের এ ঐকমত্যকে বিনষ্ট করার জন্য যারা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে, মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, তারাই মূলত মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে, তারাই মূলত আল্লাহ তা'আলার এ বিধানকে লঙ্ঘন করছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মুসলমানদের বৃহত্তর জামাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের মাঝে মতপার্থক্য, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও ছিল। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যদি মতপার্থক্য হতো, তার সমাধান দিতেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) নিজে। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবর্তমানে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। অতঃপর সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈগণ ইলম শিখেছেন। তাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন তাবে তাবেঈন।

সুতরাং অধিকাংশ শাখাগত মাসআলার মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, এর মূল উৎস হলো, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যকার মতপার্থক্য। অতএব, ডা. জাকির নায়েক এ মতপার্থক্যকে কিভাবে ইসলামের অনৈক্যের কারণ মনে করেন এবং তিনি কিভাবে একে হারাম সাব্যস্ত করেন?

চার ইমাম সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক নিজেই তাঁর "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

All these four great Aimmas, came to give us knowledge, the teaching of Allah and His Rasul. Their Madhab was no Madhab but the Madhab of the Rasul.

"বিখ্যাত এ চার ইমামের প্রত্যেকেই আমাদেরকে জ্ঞান দানের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষাই দিয়েছেন। তাদের একমাত্র মাযহাব ছিল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাযহাব।"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/ 2008/07/2 8/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

সুতরাং এ চার ইমামের মাযহাব যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাযহাবই হয়ে থাকে, তবে যারা তাঁদের অনুসরণ করছে তাদেরকে কেন সমালোচনা করা হবে?

সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতের তাফসীর

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-আন্‌মামের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন–

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ছয় নম্বর পারার সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন, "হে নবী! যে ইসলাম ধর্মে কোনো ধরনের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কী ছিলেন?

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো–

এ আয়াতটি মূলত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

[এটি ইবনে আব্বাস (রা.), যাহ্হাক, কাতাদাহ প্রমুখ মুফাসসিরগণের অভিমত। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭, তাফসীরে বাহরে মুহীত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৯]

১. এ আয়াতে যে বিভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেটি দ্বারা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মত উদ্দেশ্য হয়, তবে এখানে ওই সমস্ত লোকের মতানৈক্য উদ্দেশ্য হবে, যারা বিদআতী, প্রবৃত্তি পূজারি, স্বেচ্ছাচারী এবং পথভ্রষ্ট। [এটি আহওয়াছ (রা.) এবং উম্মে সালামা (রা.)-এর অভিমত, বাহরে মুহীত, আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহ.) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭]

২. আয়াতটিকে যদি ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে নির্দিষ্ট না করে ব্যাপক রাখা হয়, তখন উদ্দেশ্য হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অনৈক্য। যাকে এ আয়াতে

হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে।
তাদেরকে যে শাস্তি প্রদান করা হবে বা তারা যে শাস্তির যোগ্য হবে, তার জন্য হে নবী আপনি দায়ী নন। সুতরাং এখানে অনৈক্য দ্বারা ওই বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে, যা হারাম ও নিষিদ্ধ। যেমন–তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। শাখাগত বিষয় তথা দলিলের ভিত্তিতে যে মতপার্থক্য তা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭)। তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৬)
৩. এ আয়াতের একটি প্রচলিত তেলাওয়াত হলো, 'ফার-রাকু' কিন্তু আরেকটি প্রসিদ্ধ তেলাওয়াত হলো, ফা'রাকু। আর তখন এর অর্থ হবে, যারা দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। [এটি হযরত আলী, হামযা এবং কাসায়ী (রহ.)-এর ক্বিরাত, তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-৪৭০, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮, তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৫]
৪. আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই বা আপনি তাদের থেকে মুক্ত।" এ অংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, যদি আয়াতের প্রথম অংশ, অর্থাৎ যারা দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ইহুদী ও খ্রিস্টান তাহলে এ অংশের বিধান যুদ্ধের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যাবে। তাদের থেকে আপনি মুক্ত, পূর্বে যার অর্থ ছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সাথে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। [তাফসীরে তবারী, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৭২]
আর যদি প্রথম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ওই সমস্ত লোক, যারা বিদ'আতী, যারা প্রবৃত্তি পূজারি, তাহলে এ অংশের অর্থ হবে পরকালে তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনি দায়িত্বমুক্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৮, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১০]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য, তা হারাম নয়। আর ওই জিনিস কিভাবে হারাম হবে, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্তমানে হয়েছে এবং তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদের মাঝে শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং কুরআনের এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা আর মানুষের সামনে হালালকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করা কতটুকু বাস্তবসম্মত ও বৈধ? বরং এটি মুসলমানদের সাথে প্রতারণারই শামিল।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা: মাহফুজ আলম
তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :-১

জোরে আমীন বলা জায়েয কি না?

সমাধান :-১

সূরা ফাতেহার শেষে আমীন বলা সুন্নাত। কিন্তু জামা'আতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীদের জন্য জোরে আমীন বলার কোনো হাদীস না থাকায় মুক্তাদীরা নিঃশব্দে আমীন বলবে। (সুনানে তিরমিযী ১/৫৮, মুসতাদরাকে হাকেম২/২৫৩)

জিজ্ঞাসা :-২

রফয়ে ইয়াদাইন জায়েয কি না?

সমাধান :-২

রাসূলে করীম (সা.)-এর নামাযে একাধিকবার রফয়ে ইয়াদাইন ছিল বটে কিন্তু তা শুরুর দিকে, পরবর্তীতে তাকবীরে তাহরীমার সময় ছাড়া অন্য সব রফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দিয়েছিলেন তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বিধায় রফয়ে ইয়াদাইন না করা সুন্নাত। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪১৫)

জিজ্ঞাসা :-৩

বুকে হাত বাঁধা জায়েয কি না? নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল দেবেন কি?

সমাধান :-৩

পুরুষের জন্য বুকে হাত বাঁধার কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। বরং নাভির নিচে হাত বাঁধার সহীহ হাদীস পাওয়া যায়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩/৩২১)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা: জাহাঙ্গীর আলম
ইন্দ্রাবাজার, বাঘারপাড়া, যশোর।

জিজ্ঞাসা :

আমরা এশার নামাযের পূর্বে সুন্নাতে নিয়তে যে চার রাকা'আত নামায আদায় করি, তার ব্যাপারে কোনো হাদীস আছে কি না? আর যদি কোনো হাদীস না থাকে, তবে সুন্নাতের নিয়তে এশার পূর্বে চার রাকা'আত আদায় করা যাবে কি না?

সমাধান :

মাগরিব ছাড়া অন্য চার ওয়াক্তে আযান-ইকামতের মধ্যখানে নামাযের কথা স্পষ্টভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, তবে এশার পূর্বে কত রাকা'আত তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে ও হযরত আলী (রা.)-এর আমল দ্বারা চার রাকা'আত প্রমাণিত যা শরীয়তের বিশেষ একটি দলিলের অংশ। কারণ রাসূল (সা.) খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। তাই এশার পূর্বে চার রাকা'আত নামায সুন্নাতের নিয়তে পড়া যাবে। (সহীহুল বুখারী ১/৮৭)

প্রসঙ্গ : তারাবীর বিনিময়

মুহা: যাকারিয়া
হাজীনগর, ডেমরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-ক

হাফেজ অথবা ইমামকে খতম তারাবীর বিনিময়ে টাকা দেওয়ার জন্য হাদিয়ার নামে মুসল্লিদের নিকট থেকে চাঁদা উঠানো, চাঁদা দেওয়া ও ইমাম অথবা হাফেজের জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয আছে কি? এরূপ ইমাম, হাফেজ সাহেবের পেছনে নামায আদায় বৈধ হবে কি না?

সমাধান : ক

খতম তারাবীর পারিশ্রমিক আদান-প্রদান এবং এর জন্য চাঁদা উঠানো সব কিছু শরীয়ত পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গুনাহগার বলে বিবেচ্য। এ ধরনের হাফেয ইমামের পেছনে তারাবীর নামায পড়লে সওয়াবও পাওয়া যাবে না। (মুসান্নাফে আবী শাইবা ২/৪০০, রদ্দুল মুহতার ২/৭৩)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

জিজ্ঞাসা : খ

কোনো ইমাম যদি সহশিক্ষা (প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ানো হয়) চলে এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয আছে কি?

সমাধান :-খ

বর্তমান প্রচলিত সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্দার মতো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান লঙ্ঘিত হয়। আর শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘনকারী ইসলামের পরিভাষায় ফাসেক বলে গণ্য। ফাসেককে ইমাম বানানো এবং তার পেছনে নামায পড়ার অনুমতি নাই। বিধায় বর্ণিত ইমামের পেছনে নামায আদায় করার পরিবর্তে একজন দ্বীনদার যোগ্য আলেমকে ইমাম বানানো আবশ্যক। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৬০, আল বাহরুর রায়িক ১/৬১১)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

জিজ্ঞাসা :-গ

শরয়ী কারণে কোনো ইমামের পেছনে তারাবীহ নামায আদায় না করে যদি অন্য কোনো বাড়িতে জামা'আতের সঙ্গে তারাবীর নামায আদায় করা হয় তাহলে উক্ত নামায আদায় হবে কি না?

সমাধান :-গ

শরয়ী কারণে কোনো ইমামের পেছনে তারাবীর নামায আদায় না করে বাড়িতে জামা'আতের সঙ্গে আদায় করলে তা জায়েয হবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৫)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুহাম্মদ হুসাইন

মাইজভাণ্ডার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

রামাযান মাসে তারাবীর ইমাম, হাফেজ সাহেবদের জন্য জনৈক আলেমের পরামর্শক্রমে যাকাত-ফিতরার টাকা তোলা হতো, এতে যাঁদের ওপর যাকাত-ফিতরা ওয়াজিব হয়েছে তাঁরাও টাকা দিতেন আর যাঁদের ওপর ওয়াজিব হয়নি তাঁরাও টাকা দিতেন, এভাবে চাঁদার মতো হাফেজ সাহেবদের জন্য যাকাত-ফিতরার টাকা উঠানো আমার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হলো, তাই মসজিদ কমিটিকে বললাম, আমি প্রত্যেক বৎসর হাফেজ সাহেবদের জন্য আমার যাকাত ফান্ড থেকে বিশ হাজার টাকা দেব। আর আপনারা এভাবে টাকা উঠাবেন না। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাফেজ সাহেবরা যদি এখানে নামায না পড়াতেন তাহলে আমি তাঁদেরকে এ টাকা দিতাম না। এরপর ধর্মীয় কিতাবাদী অধ্যয়ন করে জানতে পারি যে, খতম তারাবীহ পড়িয়ে টাকা দেয়া ও নেয়া জায়েয নেই। এখন আমার প্রশ্ন হলো, টাকা দিয়ে আমি গুনাহগার হচ্ছি কি না?

সমাধান :

গরিবকে যাকাতের টাকার নিরঙ্কুশ মালিক বানানো যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। তারাবীর পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের টাকা প্রদান করা হলে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না। উল্লেখ থাকে যে, খতমে তারাবীর বিনিময় আদান-প্রদান কোনোভাবেই বৈধ নয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৪০০, আদ্দুররুল মুখতার ১/১২৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাসুদ রানা

নিমগাছী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

প্রায় ৬০ বছর আগে ৩ শতক দলীলকৃত জায়গার ওপর মসজিদঘর নির্মাণ করা হয়। কিন্তু সেই জায়গায় যাতায়াতের মতো কোনো প্রকার রাস্তা না থাকায় প্রায় আট বছর আগে রাস্তাসংলগ্ন একটি ছয় শতক জায়গার ওপর মসজিদঘর তৈরি এবং দুতলা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়, অর্থের সংকটে মাটির নিচের কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। বর্তমানে পূর্ববর্তী জায়গার পার্শ্বে ব্রয়লার মুরগির খামার এবং বাড়ির টয়লেট রয়েছে, এই অবস্থায় পূর্ববর্তী মসজিদের জায়গা বিক্রি করা প্রসঙ্গে স্থানীয় মুফতী সাহেব ফাতাওয়া দেন যে, ঐ জায়গা বিক্রি না করে ঘর তৈরি করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া অথবা মক্তবখানা তৈরি করে কাজ চালানোর কথা বলেন অথবা জায়গা সংরক্ষণের কথা বলেন কিন্তু তা বাস্তবে অসম্ভব। যদি বিক্রি করা যায় তাহলে বর্তমানে নির্মাণাধীন মসজিদ উপকৃত হবে। মসজিদঘরের জায়গা বিক্রি করা যাবে কি না? মসজিদ দুটির জায়গা বর্তমান যে অবস্থায় রয়েছে পরবর্তী ৫০-৬০ বছর পর জায়গার কোনো অস্তিত্ব থাকা কঠিন হয়ে পড়বে এবং যদি বিক্রি করা না যায় তাহলে এ জায়গার ওপর আমরা কী করতে পারি?

সমাধান :

কোনো জায়গা একবার শরয়ী পদ্ধতিতে মসজিদ সাব্যস্ত হলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকে, বিক্রি, পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা যায় না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ দুটির পূর্বের জায়গা মসজিদ হিসেবেই বহাল আছে। পাঞ্জেগানা নামাযের মাধ্যমে হলেও মসজিদ দুটি আবাদ রাখা মহল্লাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। আবাদ রাখা সম্ভব না হলে যেকোনোভাবে উক্ত জায়গার পবিত্রতা রক্ষার্থে সংরক্ষণ করে রাখবে। সেখানে স্থায়ী মক্তব বানানো যাবে না। তবে বুঝমান বাচ্চাদেরকে অস্থায়ীভাবে কুরআনের তালীম দেয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, কোনো জায়গা শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য তা রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া শর্ত নয়। এবং প্রথম মসজিদের জায়গাদাতার উত্তরসূরিদের জন্য তা ভোগদখল করা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/৩৭৯)

প্রসঙ্গ : কবরস্থান

আব্দুল গফুর

গুলশান, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :-১

ওয়াকফকৃত একটি কবরস্থান ২৫-৩০ বৎসর পূর্ব থেকে ধারাবাহিক মৃত দাফনে ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে কবরস্থানের ভেতর লাশ নিয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ রাস্তা বানানো যাবে কি না? নতুন/পুরাতন কবর রাস্তায় পড়ে গেলে এ ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না? এবং কবরস্থানের চতুষ্পার্শে বা এক দুই পার্শ্বে দেয়াল নির্মাণ করা যাবে কি না?

সমাধান :-১

কবরস্থানের ভেতর লাশ নিয়ে যাতায়াতের প্রয়োজনে দৈর্ঘ্য/প্রস্থ রাস্তা বানানো যাবে, যদি মাঝ পথের

কবরগুলোর লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল ধারণা হয়। অন্যথায় লাশ মিশে না যাওয়া পর্যন্ত ওই কবরসমূহের অংশ রাস্তা বানানো থেকে বিরত থাকবে।

কবরস্থানের চতুষ্পার্শে কেবল সংরক্ষণের জন্য দেয়াল নির্মাণ করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার ২/২২৩)

প্রসঙ্গ : জানাযা

জিজ্ঞাসা :-২

মসজিদের সামনে মাদরাসা তার সামনে মাঠ যা মসজিদ থেকে আনুমানিক ৩০-৪০ ফুট দূরত্বে। এখন প্রশ্ন হলো, মাঠে গিয়ে জানাযা পড়া জরুরি, না মসজিদে জানাযা পড়তে পারবে। এ ক্ষেত্রে লাশ মসজিদের ভেতরে বা বাহিরে রাখার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

সমাধান :-২

যেহেতু জানাযার নামায কোনো ওযর ছাড়া মসজিদে পড়া মাকরূহ (লাশ মসজিদের ভেতরে হোক বা বাইরে হোক) তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে মসজিদের বাইরে মাঠে গিয়ে জানাযার নামায পড়বে। (রদ্দুল মুহতার ২/২২৬)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহা: রঈসুল ইসলাম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

স্বামী যদি তার বিবাহিতা স্ত্রীর মায়ের সাথে কোনো প্রকার অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং যিনায় লিপ্ত হয় এমতাবস্থায় তার বিবাহিতা স্ত্রী ওই স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে কি না? জানার বিষয় হলো, এই বিবাহিতা মহিলার তিনটি সন্তান রয়েছে এদের হুকুম কী?

সমাধান:

শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী তার স্ত্রীর মায়ের সাথে যিনা করলে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করার কোনো সুযোগ থাকে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১৮৮) সন্তান ছোট হলে মায়ের নিকট থাকবে, তবে খরচ পিতা বহন করবে এবং পিতার মৃত্যুর পর সব সন্তান তার মিরাছে অংশীদার হবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৫৫৫)

প্রসঙ্গ : ইজারা

মুহা: সাজিদুর রহমান
চুয়াডাঙ্গা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় একটি ব্যবসার প্রচলন আছে তা এই, একজন ব্যক্তি গরুর একটি বাছুর ক্রয় করে অন্যজনের কাছে পালন করতে দেয়। পালন করার পর গরুটি বিক্রয় করা হয়। যে টাকা লাভ হয় তা দুজনের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হয়, এই ব্যবসা জায়েয হবে কি?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গরু পালনের সময়কাল ও পারিশ্রমিক নির্ধারিত না থাকায় তা শরীয়তসম্মত নয়। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৩০৮)

প্রসঙ্গ : ঈদের নামায

মুহা: আবু বকর সিদ্দিক
আলোকদিয়া, রশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞেসা :

আমাদের গ্রামে একটি খোলা মাঠ আছে, সেখানে বিগত দুই শত বছরের অধিককাল যাবৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মাঠটি বেশ বড়, যার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে বিরাট পাকা জামে মসজিদ, মাঠের পশ্চিম প্রান্তে মাদরাসার জন্য টিনের ঘর আছে এবং মাঠের উত্তর প্রান্তে একটি প্রাইমারি স্কুলের জন্য টিনের ঘর আছে। বর্তমানে গ্রামের অন্য অংশে একটি ছোট পাকা জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদের পূর্বপাশে টিনের বারান্দা করা হয়েছে। মহল্লার কিছু লোক এই ছোট মসজিদে ঈদের জামাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় ওই বড় মাঠে জায়গার অভাব না থাকা সত্ত্বেও বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর না থাকায় এই ছোট মসজিদঘরে কি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতে পারে? মহল্লাবাসীর চাপে যদি অগত্যা এই ছোট মসজিদ ঘরে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে কি মসজিদের মোতাওয়াল্লী সাহেব ইসলামের বিধানে গুনাহগার হবেন? এবং খোলা মাঠে ঈদের নামায আদায় না করে ছোট মসজিদ ঘরে ঈদের নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে, নাকি মাকরূহ হবে? উল্লেখ্য যে, ছোট মসজিদের মোতাওয়াল্লী সাহেব বড় মাঠে বড় জামাতে ঈদের নামায আদায়ের পক্ষপাতী। যদিও তার প্রতিষ্ঠিত ছোট মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

সমাধান :

ঈদের নামায ঈদগাহে (উক্ত বড় মাঠে) পড়াটাই উত্তম এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত। তবে শরীয়তসম্মত ওজরের কারণে ঈদের নামায মসজিদে পড়লেও সুন্নাত আদায় হবে। কিন্তু বিনা কারণে ঈদের নামায মসজিদে পড়লে নামায হয়ে গেলেও মাকরূহ হবে, বিধায় এটা বর্জনীয়। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত ছোট মসজিদে ঈদের নামায পড়ার কারণে মসজিদের মোতাওয়াল্লি সাহেব গুনাহগার হবেন না। (সহীহুল বুখারী ১/১৩১, আবু দাউদ ১/১৬৪)

প্রসঙ্গ : ঈদের নামায

হাজী মুহা: সাদেকুর রহমান
খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

জিজ্ঞাসা :

ঈদুল আযহার নামাযের দ্বিতীয়

রাকাআতে ভুলবশত রুকুতে যাওয়ার আগে রুকুর তাকবিরটি বাদ পড়ে যায়, এবং ইমাম সিদ্ধান্ত দেন যে, ঈদের নামাযে রুকুর তাকবির বাদ পড়ার কারণে নামায নষ্ট হয়নি, নামায আদায় হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় নামায আদায় হয়েছে কি না?

সমাধান :

ফেকাহবিদদের মতানুযায়ী অতিরিক্ত তাকবীরের ন্যায় ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাআতের রুকুর তাকবীর বলাও ওয়াজিব, যা ছুটে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়। তবে ঈদের নামাযে যেহেতু অনেক লোকের সমাগম হয়, তাই ঈদের নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা ব্যতিরেকে নামায সহীহ হয়ে যায়। সুতরাং শরীয়তের আলোকে আপনাদের ঈদের নামায আদায় হয়ে গেছে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/১০৩, আল বাহরুর রায়িক ১/৪৬৯)

প্রসঙ্গ : কসম

মুহা: জামাল উদ্দীন
ফুলতলা, কোতোয়ালি, যশোর।

জিজ্ঞাসা :

আমি কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে কসম করি যে, "অমুক গুনাহের কাজটি করব না। করলে এত টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করব।" কিন্তু আমি আল্লাহর নাম উল্লেখ করি নাই এখন আমি উক্ত কাজ করলে কসমের কাফফারা আদায় করতে হবে নাকি। উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সদকা করলেই হবে? আর উক্ত টাকা সদকা করলে কোন কোন খাতে ব্যয় করতে পারব? বিশেষত ওয়াজ মাহফিলের ইন্তেজামের জন্য ব্যয় করলে আদায় হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্য "অমুক গুনাহের কাজটি করব না" করলে এত টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করব। ব্যক্ত করার সময় আল্লাহ পাকের নাম না নিলেও তা কসম বলে গণ্য হবে। তবে উক্ত গুনাহের কাজটি করলে যেই পরিমাণ টাকা সদকা করার মান্নত করা হয়েছে, তা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব-মিসকিনকে দান করতে হবে। ওয়াজ-মাহফিলের ইন্তেজাম ইত্যাদির জন্য দিলে আদায় হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯১, আল বাহরুর রায়িক ৪/৪৭৮)

প্রসঙ্গ : কমিশন

মুহা: শফিকুল ইসলাম
নান্দাইল, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

একজন রাজমিস্ত্রি নিজ এলাকা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে রাজের কাজ করে এবং সাথে সহযোগী জোগাল নিয়ে যায়। যেই স্থানে যায় সেই স্থানের মালিক তাকে বলে আমি তোমাকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা ও প্রতি শ্রমিককে ৪০০ টাকা করে দেব। সেই মিস্ত্রি বাড়ি থেকে দুজন শ্রমিক নিয়ে যায়, এই বলে যে, সে তাদেরকে ৩০০ টাকা করে দেবে। প্রশ্ন হলো, সেই মিস্ত্রি অতিরিক্ত ১০০ টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি না? আর মালিক যদি ১০০ টাকা রেখে দেওয়ার বিষয়টি জানে তাহলে তার বিধান কী? আর যদি না জানে তাহলে তার বিধান কী? অনুরূপভাবে শ্রমিককে না জানালে বিধান কী? আর যদি মালিক ৩০০ টাকা থেকে কম দেয় এ ক্ষেত্রে মিস্ত্রির করণীয় কী?

সমাধান :

উক্ত রাজমিস্ত্রি তার দুজন শ্রমিকের সাথে যদি এইমর্মে চুক্তি করে যে, আমি তোমাদেরকে দৈনিক ৩০০ টাকা পারিশ্রমিক দেব, আর মূল মালিকের কাছ থেকে কমবেশি নিলে তাতে তোমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। তাহলে উক্ত মিস্ত্রির জন্য অতিরিক্ত ১০০ টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে। কিন্তু যদি সে শ্রমিকের সাথে চুক্তি করা ব্যতীত বাহানার মাধ্যমে তার শ্রমিককে এ কথা বোঝায় যে, আমি মূল মালিকের কাছ থেকে ৩০০ টাকাই এনে তোমাদেরকে দিই। তাহলে তার জন্য অতিরিক্ত টাকা নেয়া জায়েয হবে না। এ হিসেবে প্রশ্নেবর্ণিত অতিরিক্ত টাকা চুক্তিভিত্তিক হওয়ার কারণে হালাল হবে। মূল মালিক যদি টাকা কম দেয়, তখন শ্রমিকের কাছে আরযী পেশ করতে পারে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৪৭)

প্রসঙ্গ : নামাযের কাতার

আব্দুস সালাম মিয়াজী
বরমা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

জিজ্ঞাসা :-১

সাত বছরের ঊর্ধ্বে নাবালেগ ছেলেরা গ্রামের মসজিদে নামায পড়তে আসে। তারা জামা'আতের সময় কোথায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে?

সমাধান :-১

বুঝবান নাবালেগ ছেলে একা হলে বড়দের কাতারে দাঁড়াবে। একাধিক হলে বড়দের পেছনে ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে। তবে ভিন্ন স্থানে দাঁড়ালে দুষ্টামির সম্ভাবনা থাকলে বড়দের কাতারের ফাঁকে দাঁড় করানো যেতে পারে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮০)

প্রসঙ্গ : রোজা

জিজ্ঞাসা :-২

রোজা ছিলাম, সেই অবস্থায় বলেছি রোজা থাকব না। তাতে রোজা ভেঙে যাবে কি? টিভিতে বলেছে ভেঙে যাবে।

সমাধান :-২

রোজা অবস্থায় রোজা রাখব না বলা বা কেবল শুধু রোজা ভাঙার নিয়ত করার দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০, আল বাহরুর রায়িক ২/৯০)

মলফূজাতে আকাবের

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

সূর্যের তিনটি গুণ

আমীরে তাবলীগ হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব কান্ধলভী (রহ.) বলেন, মানুষ নিজের মধ্যে সূর্যের তিনটি গুণ অর্জন করা চাই। ১. সূর্য সর্বদা হরকতে থাকে, কোনো সময় তা ক্ষান্ত হয় না। তেমনিভাবে আমাদেরও দ্বীনি মেহনত সব সময় চালু রাখা উচিত। ২. সূর্য সারা বিশ্বকে কোনো ভেদাভেদ ছাড়া আলোকিত করে। তেমনিভাবে আমাদের ঈমানের আলো ও বিশ্বব্যাপী হওয়া উচিত। ৩. সূর্য নিজের আলো ও তাপ বিতরণে কারো থেকে বিনিময় চায় না, তেমনিভাবে দ্বীনের আলো বিতরণে আমাদেরও কোনো বিনিময় না চাওয়া উচিত। (আল্লাহ ওয়ালোও কী মকবূলিয়্যত কী রায়-৯০)

গুনাহের অনুভূতি

আল্লামা কারী সিদ্দীক আহমদ বান্দভী (রহ.) বলেন, আজ আমরা গুনাহের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছি, দেখা যায় দুনিয়াবি বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে মামলা হলে, খাবারের কথা ভুলে যায়। একদিকে মা কান্নাকাটি করে, অপরদিকে পিতা কান্নাকাটি করে যে, হায়! আমার ছেলে মামলায় ফেঁসে গেছে। হুকুমতের অপরাধে তো এতটুকু অনুভূতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে কেউ আল্লাহর নাফরমানী করে অপরাধী হয়ে গেলে এ ব্যাপারে না অপরাধীর অনুভূতি হয় না পিতা-মাতা বা তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের। বাস্তবে যদি গুনাহ অপরাধ হওয়া আমাদের বুঝে আসত, তাহলে যতক্ষণ তাওবা-ইস্তিগফার করে সে গুনাহ মাফ করিয়ে না নেওয়া হয় আমাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা আসত না। (প্রাগুক্ত-১৮২)

যিকিরের প্রভাব

আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, যার মধ্যে আল্লাহর যিকিরের প্রভাব বিস্তার করে সে আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত জিনিসে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে লজ্জা করে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে দুনিয়ার প্রভাব বিস্তার করে সে শুধুমাত্র ওই সমস্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকে যা দুনিয়াবাসীর নিকট দোষণীয় হয়। (আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ)

দ্বীন ও শরীয়তকে অগ্রাধিকার দেওয়া

হযরত মাওলানা সূফি মুখলিসুর রহমান (রহ.) (খলিফায়ে হযরত গাংগুহী (রহ.)) বলেন, আমি একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছি যে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, দারিদ্রাবস্থায়, ধনাঢ্যাবস্থায় মোটকথা সর্বাবস্থায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দ্বীন ও শরীয়তের ওপর অটল থাকুন এবং সব বিষয়ে দ্বীন ও শরীয়তকেই প্রাধান্য দিন। শরীয়ত ও সুন্নাত পরিপন্থী কোনো কাজ করবেন না। নিজকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে গুনাহ থেকে বাঁচান। (তাযকিরায়ে মুখলিছ-৬৭)

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) বলেন, মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ১. খোদাভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে নিজের সংশোধন। ২. প্রচার ও তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

শরীয়ত ও ত্বরীকত

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, দ্বীনে ইসলামের জাহের ও বাতেনের নামই শরীয়ত ও তরীকত। যেমনিভাবে প্রকাশ্য আমলসমূহের জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুম ফরয এবং ওয়াজিব আছে, তেমনি বাতেনী বা অপ্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রেও আছে। আমরা উভয়টি আদায় করার জন্য নির্দেশিত। এর সাথে একটি জরুরি বিষয় হলো হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হক। প্রত্যেকের ওপর নিজ মাতা-পিতা, বিবি-বাচ্চা, দোস্ত-আহবাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের হকসমূহ আদায় করা ফরয। এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি কিঞ্চিত পরিমাণ ও সংকীর্ণতা করে তার গায়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সামান্য হাওয়া ও লাগবে না। যদিও সে পূর্ণ জীবন প্রচলিত তাসাউফের মুজাহাদা ও নফল ইবাদাতে মগ্ন থাকে। মনে রেখো, আল্লাহর মাখলুককে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এমন ধারণা যা অসম্ভব ও পাগলামি বৈ কিছুই নয়। (আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ-৩৬)

কথা কখন ক্রিয়াশীল হয়?

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলতেন, ভালো কথা যদি ভালো নিয়তে ন্যায়সঙ্গত নিয়মে বলা হয় তার কখনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। সে কথা দ্বারা কখনো ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে না। (ইসলাহী খুতুবাত ৮/২৬৩)

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156

ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent

হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাতিলের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে
"আল-আবরার" এই কামনায়

জনপ্রিয় ১৯৩৭ সাবান

প্রস্তুতকারক

হাজী নুরআলী সওদাগর এন্ড সন্স লিঃ
চাক্তাই, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : বিক্রয় কেন্দ্র : -০৩১-৬৩৪৯০৫, অফিস: ০৩১-৬৩২৪৯৩, ৬৩৪৭৮৩

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে

আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন

৫,৬
ফেব্রুয়ারী ২০১৫
বৃহস্পতি ও শুক্রবার
প্রত্যহ বিকাল ২ঘটিকায়

স্থান :
জমিয়তুল ফালাহ
ময়দান চট্টগ্রাম

সম্মানিত মেহমানগণ

বিশ্ববরেণ্য আলেমেদ্বীন, ওলিয়ে কামিল হযরত
মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী
মুহতামিম, বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ।

খতীবে ইসলাম, আওলাদে রাসূল (সা.) হযরত মাওলানা
সায়্যিদ শাহ্ আব্দুল মজীদ নদীম

সদরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, আওলাদে রাসূল (সা.) হযরত মাওলানা
সায়্যিদ আরশাদ মাদানী
সিনিয়র মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ।

নায়েমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, আওলাদে রাসূল (সা.) হযরত মাওলানা
সায়্যিদ মাহমুদ মাদানী

আরো দেশ বরেণ্য
ওলামায়ে কেরামের শুভাগমন

সকলের প্রতি দ্বীনি দাওয়াত রইল

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম শাখা ঃ এর প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সম্মেলন কার্যালয় (আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া দামপাড়া) হতে প্রচারিত। ফোন: ৬১৫১৪৬, মোবাইল: ০১৭১১২০২৩৪৩